ঈশানকোণ

গ্রীষ্ম সংখ্যা মে ২০১৭ ঈশানকোণ-৫

সম্পাদকঃ সদানন্দ সিংহ

সূচিপত্র

গল্প

বিশ্বদীপ দে, সদানন্দ সিংহ, বৈদূর্য্য সরকার, তনিমা হাজরা, নীহার চক্রবর্তী, এল বীরমঙ্গল সিংহ

গল্পাণু

ব্রতীন বসু, সদানন্দ সিংহ, অজয় বৈদ্য

মুক্তগদ্য

অরুণিমা চৌধুরী, স্বর্ভানু সান্যাল

নিবন্ধ

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, অশোকানন্দ রায়বর্ধন

অন্যান্য

মুখোমুখি, আলোচনা, লেখাজমা

ছড়া

দেবীস্মিতা দেব, শঙ্কর দেবনাথ,

কবিতা

মণিপুরের কবিতা, নকুল রায়, মাসুদ খান, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা রায় বিশ্বাস, দিশারী মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ তেওয়ারী, তৃষ্ণা বসাক, সদানন্দ সিংহ, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, তৈমুর খান, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ালী বসু, অরুণিমা চৌধুরী, তুষ্টি ভট্টাচার্য, বনানী ভট্টাচার্য, নীতা বিশ্বাস, প্রণব বসুরায়, তমা বর্মণ, অঞ্জন বর্মন, তুষারকান্তি রায়, চয়ন ভৌমিক, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, অভিষেক ঘোষ, শুভেশ চৌধুরী, সন্তোষ রায়, মেঘনা চট্টোপাধ্যায়, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, সমিত ভৌমিক, মাধব বণিক, রুদ্রশংকর, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ব্রতীন বসু, চিরশ্রী দেবনাথ, আশুতোষ রানা, সুব্রত দেব, অভিজিৎ চক্রবর্তী, বিদিশা দাস, এ কে এম আব্দুল্লাহ, শ্রীময়ী গুহ, শ্রীয়া ঘোষ সেন, রূপক গুহ, আনিস আহমেদ, সুবীর ঘোষ, সুবিনয় দাশ, দিলীপ দাস, লক্ষ্মণ বণিক, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, সন্‌জিৎ বণিক,

[সম্পাদক, প্রকাশক এবং ওয়েব ডিজাইনঃ সদানন্দ সিংহ]

কিছু কথা

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শুনি, সেটা হচ্ছে – ফেসবুক সাহিত্য। ‘‘ফেসবুক সাহিত্য’’ নামটা শুনে অনেকে আবার নাক কোঁচকান, এটা আবার সাহিত্য নাকি! আবার অনেকে অত্যুৎসাহে বলেন, ডিজিটাল যুগের পক্ষে ফেসবুক সাহিত্যই উত্তম। সত্যি কথা বলতে গেলে ফেসবুককে একটা সাহিত্যের মাধ্যম বলে অনায়াসেই স্বীকার করা যায়। আগে যেমন একটা লেখা প্রকাশ করার জন্যে কোন সাহিত্যের পত্রিকায় বা ম্যাগাজিনে পাঠিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকতে হত, সেখানে এই অপেক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই এই ফেসবুকে। তারপর ধরুন, আপনার লেখা কোনো পত্রিকায় বা লিটল ম্যাগে প্রকাশিত হলো যেটার প্রচারসংখ্যা হয়তো একশো বা কয়েকশো, কিন্তু পাঠক কতো জন সেটা কেউ সঠিকভাবে বলতেও পারবেন না। হয়তো সেটা পাঁচ হতে পারে বা বড়জোর পঞ্চাশ হতে পারে। সেদিক দিয়ে ফেসবুকে পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি। তবে ফেসবুকটা অনেকটা ফ্রি স্টাইল রেস্টলিং-এর মতো, যে যা খুশি লিখে ইচ্ছেমতো নিজের দেয়ালে পোস্টালেই হল, পাঠকগণকে ডেকে আনার দরকার নেই। তবে সমস্ত পাঠকরা পড়ার পর লাইক-কমেন্ট নাও করতে পারেন। লাইক-কমেন্ট পাবার জন্যেও এখানে সার্কেল-এ থাকতে হয়। সে সার্কেলে থাকলেই ‘অসাধারণ’ শব্দের কোনো ঘাটতি হয়না। তার জন্যে মোটেই অসাধারণ লেখার দরকার হয়না। যেহেতু এখানে নিজের লেখার নিজেই সম্পাদক, তাই প্রশ্ন উঠে লেখার মান নিয়ে এবং লাইক-কমেন্ট দিয়ে মান যাচাই করা যায়না। অনেকেই এখানে হাত পাকাচ্ছেন। কোনো কিছুই খারাপ নয়। অনেক ভালো লেখাও দেখতে পাই। সত্যিই এই প্ল্যাটফর্মের তুলনা হয়না। তবে একটা খারাপ দিকও আছে, সেটা হচ্ছে আয়ু। যত ভালো লেখাই হোক না কেন, ফেসবুকে তার আয়ু মাত্র কয়েকদিন। তারপর সব চাপা পড়ে যায়। সেদিক থেকে ওয়েবজিন বা ব্লগজিনের মেয়াদ অনেক দীর্ঘস্থায়ী।

-- সদানন্দ সিংহ

সূচিপত্র

কবিতা

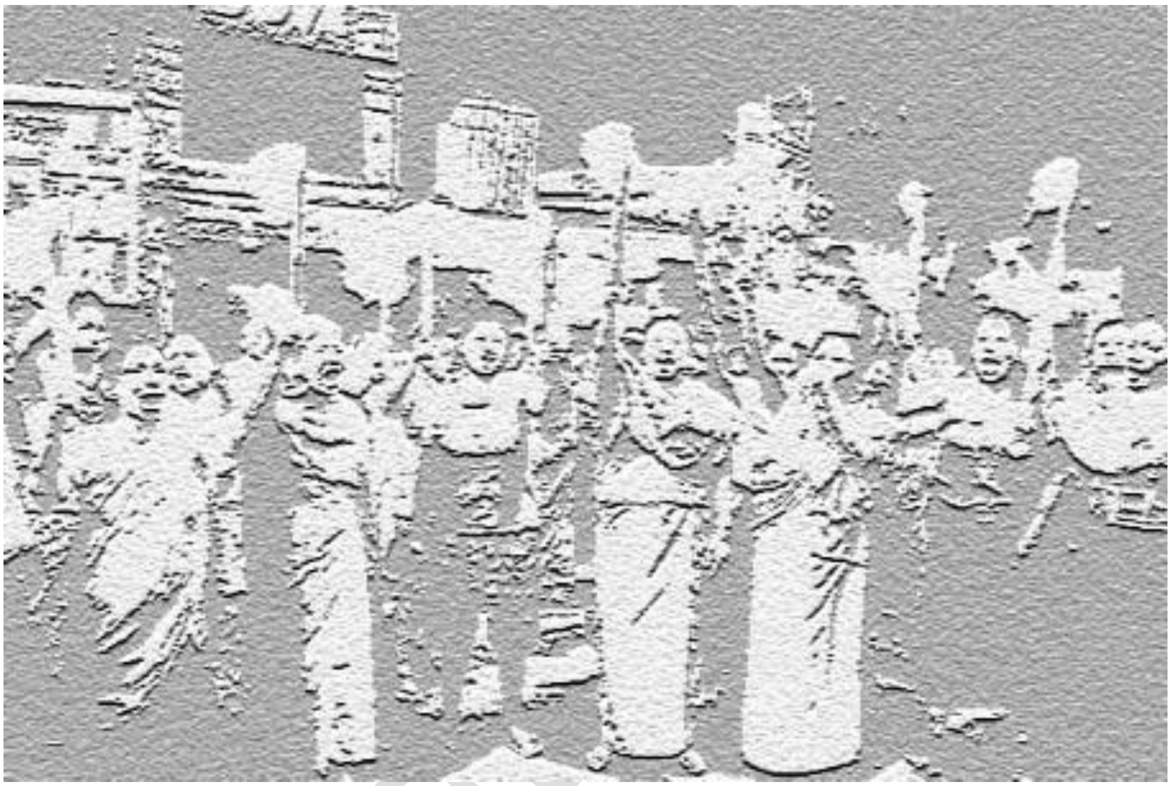

মণিপুরের তিনটি কবিতা

[মণিপুরি থেকে অনুবাদঃ সদানন্দ সিংহ**]**

আয়ু

ই. নীলকান্ত সিং

ছায়াপথের মাঝে কতোবার খুঁজেছি
জীবনের কী মানে
বন্ধ চোখে কতোবার বসে গেছি
দেখা হবে বলে

হাজার সূর্যের এক মিছিল

খুঁজে গেছি কেবল সারাজীবন
পাই নি কিছু, ব্যর্থ হয়ে এসেছি ফিরে
উপায়হীন হয়ে বুঝে গেছি – এক ধারণা, গতিহীন

তারপর ছুঁয়ে দেখেছি এক ফুলকে
ঝরে গেছে সেটা এক পলকে
চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে এক আলো, সৌন্দর্যের

গুরুতর এক প্রশ্ন নেমে আসে অসময়ে
জীবনের মানে তবে কি এই ?
অর্থহীন ঔজ্বল্য
যেন কোন আগুনের ফুলকি !

[মণিপুরের প্রয়াত কবি ই. নীলকান্ত সিং-এর লেখা কাব্যগ্রন্থ ''তীর্থযাত্রা'' থেকে]

বাগান

রাজ কুমার ভুবনস্না

এখানে নেই।

ঝরে যাওয়া ফুল
আর ঝরা পাতার ওপর
পদধ্বনির
যে প্রথম আওয়াজ
আর আমার ঘুমহীন সারারাত

এখানে ফুলবাগান নেই।

অজান্তে উড়ে যাওয়া
পাখিদের ডানার শব্দ
উদ্‌ভ্রান্ত চোখের
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
ফোটেনি বুকে কোন ফুল
একপলক

এখানে ফুলবাগান নেই।

[মণিপুরের কবি রাজকুমার ভুবনস্নার কাব্যগ্রন্থ ‘‘অশাংবা ঊনাগী মমি’’ থেকে]

গৃহহীনের ঘর

শরতচান্দ থিয়াম

সমস্ত চোখ যদি বন্ধ হয়ে যায়
কী আর লাভ হবে অর্গস
একশোটা চোখ থেকেও ?

বিরামহীন
নির্মিয়মান ঘর কতো
সংখ্যাহীন
কিন্তু কে করবে বাস

এই ঘরে
তোমার বন্ধ চোখের সামনে
তৈরি যেসব ঘর ?

দীর্ঘ নীলনদ
আর তুলনাহীনা নদী ইম্ফাল
তুমি তো ছিলে ঘুমিয়ে
তখন নীলনদ আর নদী ইম্ফাল,
সব একাকার
কতোবার হয়েছে অর্গস।

কী করে গাইবো এখন
আমার প্রাণ আমার দেশের গান
গৃহহীনের ঘরে ?

[মণিপুরের কবি শরতচান্দ থিয়ামের কাব্যগ্রন্থ ‘‘য়ূমলিংদবাশিংগী য়ূম’’ থেকে]

ঈশানকোণ

সূচিপত্র

কবিতা

দিশারী মুখোপাধ্যায়ের দু’টি কবিতা

ভালোকে বাসাবাসি কর

তুই বারবার বলছিস ওপথে যেও না
কেন যে বলছিস জানি না, জানতে চাইও না
শুধু জেনে রাখ আপাতত আর কোন রাস্তা নেই এখানে
অন্য যেগুলোকে রাস্তা ব’লে ভাবছিস
সেগুলো আসলে মারাত্মক বিষধর সাপ মাত্র
না, কোন ভয়ংকরকেই ভয় পাওয়ার বা স্যালুট করার লোক আমি নই
কিন্তু একথা তো মানবি, মানুষের পাশে মানুষ না থাকলে
বিশুদ্ধ পানীয় জলও লকলকিয়ে হ’য়ে ওঠে হেমলক

এখন বন্ধু বন্ধুকে বলছে - কই চিনি না তো !
রাস্তা রাস্তাকে আড়াআড়ি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর বরফের স্ল্যাবে
আর তার বন্ধু তখন পিকিনিকে হট্‌পটে ড্রিংকে আর নাচে

বরং যে আমাকে মারতে চাইছে আমি তো তাকে জীবনদায়ী ভেবে
নিজের শরীরে ইন্জেক্ট করবো না
এইটুকু বুঝে ওঠার সুযোগ যে আমাকে দিয়েছে
পৃথিবীর পলিউসনের জন্য তাকে অন্তত বিভীষণ বলা যাবে না

সাবধানে থাকিস রাস্তাকে সঙ্গে নিয়ে
আর সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে তাকে বানিয়ে তুলিস ভালো বাসা
ভালোবাসা কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না
সংগ্রহ করতে হয় পাথর ভেঙে

কুশল ইন্ডিয়া

গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে বুকের কাছে
বুকের ভেতর সব কুবেরের গুপ্তধনের মৌরি-গন্ধ
হাওয়ার স্রোত হাওয়া হওয়ার জন্য নদীর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে
গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে
কাকে কবে কতটা তারা অক্সিজেন দেবে, কাকে দেবে ফল

আকাশের ছোট ছোট তারাগুলো ভাবছে
পৃথিবীর এত বড় বড় সব মানুষগুলো এতো ছোট হচ্ছে কী ক'রে
কেনই বা বড় না হ'য়ে ছোট হবার এমন আকুল প্রয়াস

পাখিরা ঠিক করেছে গাছের ডালে ব'সে ব'সে মানুষকে গান শোনাবে
গান শুনতে শুনতে যদি কোনদিন মানুষগুলো আকাশ হ'তে পারে
সেদিন তারা ঘর গেরস্থালির পুরো দায়িত্ব তাদের উপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে
ডানা দিয়ে আলপনা আঁকা শেখানোর জন্য একটা ইউনিভার্সিটি খুলবে

সূচিপত্র

সৃজন

মুক্তগদ্য

ছেলেবেলার প্রথম দশবছর

অরুণিমা চৌধুরী

ছেলেবেলা এমন একটা পুঁটলি, যেখানে হাত ঢোকালে সব প্রথমগুলো উঠে আসে, তাই.. "এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু.. পালাতে চাই যত সে আসে, আমার পিছুপিছু ".. নাহ। পালাতে চাইনা। মুখ লুকোতে চাই। আমার এলেবেলে ছেলেবেলাটা, আমার ভ্যালবেলে ঢিলে ইজের নেড়া মাথা আর সাদা নিমার ছেলেবেলাটায় উঁকি দিলে, মনে পড়ে কতকিছু..

সেই রাতটা জলের রাত। আমার একদম প্রথমদিকের স্মৃতি.. দেওয়াল বেয়ে জল পড়ে মশারি ভিজে যাচ্ছে..সারা ঘরে ছাদ চুইয়ে টোপা জল আমার মজা লাগছে, মা আমায় কোলে নিয়ে গোটা রাত টেবিলের তলায়..সেবার খুব বন্যা হয়েছিল।

সেই ছোট্টবেলার আরেকটা স্মৃতি ভীষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়.. তখন সম্ভবত আমি বছর তিনেক, ভাত খেতে চাইছিনা। মা গল্প করছে, আগের রাতে জ্যেঠির উঠোনের চাপা দেওয়া ঝুড়ির মধ্যে থেকে কীভাবে বনবিড়ালে মুরগি ধরে নিয়ে গেছে, কীভাবে গলাটা ছিঁড়ে খেয়েছে। আমি প্রশ্ন করছি, এই ডিম টা কি ওই মুরগিটার.. আমার চোখের সামনে ভাসছে গলা কাটা রক্ত মাখা মুরগির ছবি.. আমার ওয়াক পাচ্ছে.. বুঝিয়ে বলতে পারছিনা.. শেষপর্যন্ত হড় হড় করে বমি।

আমাদের তিন কামরার ছোট্ট বাড়িতে একটা ঘরে তখন ভাড়াটে, আরেকটা ঘরে আমরা। ভাড়াটে কাকিমার ছেলেটি আমার থেকে বছর খানেকের ছোট, নাম -- গজ.. কোনকালে অজয় থেকে অজ, তার থেকে যে গজতে রূপান্তরিত হয়েছে, সে বোধহয় কাকিমাও ভুলে গেছেন এতোদিনে। তা সেই গজ হল গিয়ে আমার বুজম ফ্রেন্ড। তখনকার দিনে বাচ্চাদের চেপে কোলে শুইয়ে চোখে টেনে টেনে কাজল পরিয়ে দেওয়া হত। আমার মায়ের ধৈর্য এবং আমার সহ্য কম হওয়ায়, প্রায়শই পালিয়ে কাকিমার কোলে উঠে পড়তাম। আর কাকিমাও দিব্যি কোন কায়দায় কাজল পরিয়ে ভদ্রসভ্য সামাজিক করে তুলতেন। সেই গজ আর আমার একই সাথে পালা করে একবার কাকিমার, তো আরেকবার নিজের মায়ের স্তন ভাগ করে নেওয়া, একবার পাশবালিশের অধিকার নিয়ে ঝগড়া মারপিট..আরেকবার ঝাঁটার কাঠি ভেঙে ভেঙে গজ'র পেটে সাজিয়ে সেলাই সেলাই খেলা।
সঞ্জয় গান্ধী যেদিন মারা গেলেন, আমরা দুই ভাইবোন মিলে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, লোকটা খুব ভালো ছিল, বাচ্চাদের ভালবাসতো তো, তাই ভগবান ওকে মেরে ফেলেছে। ভগবানটা তো খুব পাজি, এই যেমন আমার বাবাকেও মেরে ফেলেছে!

এরপর একটু একটু করে লেখাপড়া শুরু। গজরা চলে গেলে, কাকু ওই ঘর ভর্তি টিউশন পড়াতে শুরু করলো। সারাঘরে সতরঞ্চি পেতে সবাই পড়তো, আমিও স্কুলে ভর্তি হবার আগেই শিখে গেলাম অ আ, এক দুই.. এ বি সি ডি.. অনেক কিছু।
এইসময় থেকেই, সকালে মা স্কুলে চলে গেলে আমার জিম্মাদার তখন জ্যেঠি। জ্যেঠি গোবর ছেনে ঘুঁটে দেয়, আমিও ছোট্টছোট্ট বিস্কুটের মতো ঘুঁটে দিই। "জ্যেঠি, এই ঘুঁটেগুলা আমারে দিবা তো!" জ্যেঠি দুধ দিতে যায় বাড়ি বাড়ি, আমি ট্যাঁকে। জ্যেঠির সকালের জলখাবার, জল দেওয়া বাসি পান্তা ছেঁকে কালোজিরে কাঁচা লঙ্কা আর নুন হলুদ মিষ্টি দিয়ে ভাত ভাজা..পাঁচ ছেলেমেয়ের সাথে আমিও.. বিরক্ত করি খুব, রান্না করতে দিইনা, মায়ের জন্যে মন খারাপ করলেই, ছুট্টে এসে বারান্দায় মেলা মায়ের কাপড়খানা জড়িয়ে চুপচাপ মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকি, জানি আমার কাঁদতে নেই। জ্যেঠি বুঝতে পারতো সব। কাজ ফেলে, বুকে নিয়ে শুকনো স্তন মুখে গুঁজে দিলেই ঘুমিয়ে পড়তাম...
এর ফাঁকে ফাঁকে বেশিরভাগ দিনই ছোট্ট অ্যালুমিনিয়াম বাক্সটায় গোটাকতক বই আর একটা ফ্রক বগলে কাছেই মামাবাড়ি বা সেজো দিদার বাড়িতে আমাকে চালান করা হত, যে সময়টার কথা বলছি, তখনো স্কুলে ভর্তির বয়েস হয়নি। সেজো দিদা মানে মায়ের সেজো কাকিমা।

যেদিন সেজো দিদার বাড়ি যেতুম, রান্নাঘরে চাল ভিজানো দেখলেই খলবল করে ভেজা চাল ছানতে বসতুম, হাত থেকে ছোট ছোট দানা গুলো পিছলে যেতো, সেইটে ছিল খুব মজার খেলা। সেজোদিদার বাড়িতে মায়ের বাল্যবিধবা পিসি থাকতেন, তাঁর পিতৃদত্ত নামটি যে কী.. সেকথা আমি জানিনা, তবে তিনি আমাদের কোদাল দিদা। অমন রূপসী মানুষটার কেন যে অমন বিতিকিচ্ছিরি নাম হয়েছিল, জানা নেই, তবে তাঁকে আমি এক্কেবারে পছন্দ করতাম না। আমায় দেখলেই গান ধরতো, "মিঠাইয়ের বর এসেছে ন্যাংটা লো ন্যাংটা, অমিতা মাথায় দেলো ঘোমটা".. আসলে এর পিছনের গল্পটি হল, সেই সময়, পাড়ায় রাধু পাগলার আবির্ভাব হয়েছিল। সে বেচারি অবশ্যই ঠিকঠাক জামাকাপড় পরতো না, কোমর ছেঁচড়ে চলতো, সে ভালো কথা, তবে কাউকে কখনো মারধোর করে-টরে নি। একদিন বিকেলে কয়েকটি আম কেটে আমি মারফত মা রাধুকে পাঠালে, বসে থেকে দায়িত্ব নিয়ে সেই আম তাকে খাইয়ে এসেছিলাম.. তো বলাই বাহুল্য, এরপর থেকে পাড়ার হল্লা বাহিনী, বা বড়রাও কী করে যেন টের পেয়ে গেলো, "রাধুর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো" গোছের সস্তা ঠাট্টাগুলোয় আমি ভয়ানক রেগে যাচ্ছি, এবং ক্রমাগত রাধুকে ডিফেন্ড করে চলেছি। সেই সময়গুলো অনেক অনেকদিন একদম একরকম.. দিদার বাড়ি, মামার বাড়ি, জ্যেঠির বাড়ি.. যেখানেই রেখে যাক, সময় পেরিয়ে গেলেই, মায়ের জন্যে মনখারাপ, ফ্রকটা দলা পাকিয়ে বগলে গুঁজে, হাতে বাক্সটা নিয়ে রাস্তার দিকে অসহায় তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা.. এক একদিন। মা ফিরতো না.. স্কুল থেকেই হয়ত কোন কাজে চলে গেলে, সেদিন আমি ওভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম পাথর হয়ে। কখনো কাঁদতাম না, অথচ ওই সময়টায় আমার সামনে কেউ জোর দেখাতো না..

এরপর আমি স্কুলে ভর্তি হলাম, বাংলা মিডিয়াম প্রাইমারি স্কুল। লেখাপড়া করতে মন্দ লাগেনা..কিন্তু একদিন দাদুবাড়ি, মামাবাড়ি.. সব একে একে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো.. এই যারা উদ্‌বাস্তুর মতো একবার এই বাড়ি, একবার ওই বাড়ি করে, তারা বোঝে.. অতিথ কখন অযাচিত হয়.. আমি যে নিত্য অতিথ! সেই ক্লাস ওয়ানেই কেমন সব চটপট বুঝে নিলাম, একটা বাড়িতে বারবার থাকতে নেই। সেই থেকে শুরু হল কাকুর সঙ্গে সাইকেলে পাড়ি দিয়ে প্রায় ন-দশ কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে কাকুর বাড়ি যাওয়া.. শুধু দুমুঠো খাবারের জন্য। সহিষ্ণুতার শিক্ষা.. ঝড়জলে সিট নয়, শুধুমাত্র রডের উপর বসে রোজ অতটা পথ আমি পাড়ি দিতাম। কাকুর ধারালো চটির ঘষায় পায়ের গোড়ালির ছাল উঠে ঘা হয়ে যেতো। ঝড়জলে ভিজে টনসিল পেকে জ্বর আসতো, খিদে চেপে রাখা আমার রোগের লিস্টে পার্মানেন্টলি জায়গা করে নিলো গ্যাস্ট্রাইটিস। সকালে মা স্কুলে বেরোনোর আগে চা আর দুটো বিস্কিট, তারপর স্কুলে যেতুম একটা বাপুজি কেক নিয়ে, সেই প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম, বাপুজি কেকে প্রতিদিন পিঁপড়েটা খুঁজে বের করাও একটা ভালো খেলা। ফিরে এসে ড্রেসটা একা একা পালটে নিয়েই কাকুর সঙ্গে দৌড়। সেখানেও দিদা, পিসি, ছোটকাকু, বড়কাকু, কিন্তু সেটা আমার আপনার জায়গা ... দিদা তাড়াহুড়োয় ভাত মেখে খাইয়ে দিতো, স্নান করিয়ে আমার সত্য সাঁইবাবার মতো ঝাঁকড়া চুল শ্যাম্পু করে, আঁচড়ে, অযত্নের ছাপগুলো রোজ মুছে দিতো। আমার দিদুন..সম্পর্ক গুলো রক্তের না হলে বাঁধনটা বড় তীব্র হয়, তাই না! মায়ের সঙ্গে

সেই শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভিড় বাস ঠেঙিয়ে আবার বাড়ি। উনোন ধরিয়ে রান্না হতে হতে দুটো, আড়াইটে বেজে যেতো।.. সেই ছোট্ট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে উঠতে যখন, ক্লাস টু, ততো দিনে ঘরমোছা, বাসনগুলো মেজে দেওয়া ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা বা তোলা.. সবজি কেটে দেওয়া.. আমি শিখে ফেলেছি। শিখে ফেলেছি হার্টের রুগি মা মাঝেমাঝেই অজ্ঞান হয়ে গেলে একা একা দরজা কী করে খুলতে হয়, কী করে রুটি বেলতে হয়, কী করে আরো আরো অনেক কিছু.. যা বোঝার নয়.. .. বুঝে ফেলেছি, পড়াশুনো আমার একমাত্র এক্সেলেন্সি, কোন আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শুধু ঘরভর্তি বই ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রথম পড়তে শিখলাম যখন, মা বলতো, যা পাবি বানান করে জোরে জোরে পড়বি, মানে বুঝতে হবেনা..আমি বানান করতে করতে দেশ পড়তে শুরু করলাম, বানান করতে করতে পড়ে ফেললাম, অনেক কিছু.. যার জলদি জলদি বড় হয়ে উঠতে হয়, জীবন যাকে কুঁড়িতে ফুটিয়ে দেন.. সে সাড়ে আটেই নারী হয়ে ওঠে..সামলাতে শিখে ফেলে আস্তে আস্তে ঘটে চলা পরিবর্তন, ঈশ্বর কিনা জানিনা, প্রকৃতি আমায় বিদ্রোহী করে পৃথিবীতে পাঠানোর ফলে, জনসমক্ষে আমার বেড়ে ওঠা শরীরটা নিয়ে মায়ের সঙ্কোচবোধ, কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে নিজেকে খোলসে মুড়িয়ে রাখার চেষ্টা, মাত্র সাড়ে আট বছরেই আমাকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল বহিরঙ্গেও… দশ বারো তেরো হবার আগেই আমার শৈশব ফুরিয়ে গিয়েছিল।

[সুচিপত্র]

নিবন্ধ

মগজাতি ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জনসংস্কৃতিতে তার প্রভাব

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

দক্ষিণ ত্রিপুরার যে প্রাচীন জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মধারার সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে প্রধান হল – মগ, চাকমা ও বড়ুয়া জনগোষ্ঠী। এরাই আবার এ দেশের সন্নিহিত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও বসবাস করছেন। আমাদের প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে 'মগ' নামে একদল ভয়ংকর জলদস্যুর উল্লেখ আছে। যারা আরাকান প্রদেশ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সমুদ্র ও নদীতীরবর্তী জনপদসমূহে অত্যাচার, লুণ্ঠন, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি অপকর্মের জন্যে কুখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু এখানে যাঁদের 'মগ' বলে অভিহিত করা হয় তাঁরা কিন্তু নিজেদের 'মগ' নামে পরিচয় দিতেও অস্বীকার করেন। প্রসঙ্গত, এখানে একটি সত্য কথা অবশ্য উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী যে জনজাতিকে আমরা 'মগ' নামে আখ্যায়িত করি, তাদের মধ্যে ইতিহাসকথিত মগ

জলদস্যুদের মতো কোনও হিংস্রতার লক্ষণই দেখা যায়না। বরং ভগবান তথাগত বুদ্ধের শান্তি, মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা অত্যন্ত সরল সাদাসিধে ও নিরীহ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। এই জনজাতিগোষ্ঠী যেখানেই বাস করছেন সেখানেই অন্য আরও কয়েকটি জনজাতিগোষ্ঠীর জনগণ পাশাপাশি বসবাস করতে আজো দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থানের এই ইতিহাস ত্রিপুরাতে ঐতিহ্যগতভাবেই প্রাচীন। সম্ভবত, আরাকানি জলদস্যুদের সঙ্গে দৈহিক সাযুজ্য লক্ষ করেই এই জনজাতিয় গোষ্ঠীকে সমতল অংশের মানুষেরা 'মগ' বলে আভিহিত করে গুলিয়ে ফেলেছেন। অথবা এই জনগোষ্ঠীর লোকেরাও আরাকান থেকে এসেছেন বলে এবং 'মগ' জলদস্যুদের সঙ্গে এদের ভাষাগত সামঞ্জস্য থাকার কারণেও তাঁদের 'মগ' অভিহিত করা হয়ে থাকতে পারে।

স্থানীয়ভাবে যাদের 'মগ' বলা হয় তারা নিজেদের আরাকানি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এতে তাঁরা গর্ববোধ করে থাকেন। এই আরাকানিদের বিভিন্ন গোত্র আছে। তার মধ্যে মূল আরাকানে যারা বাস করেন, তারা নিজেদের 'রখইঙসা' বা 'রখইঁসা' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই রখইঙ বা রখইঁ থেকেই রোসাঙ (রখইঁ>রখঙ>রাহাঙ>রোহাঙ>রোসাঙ) শব্দের উৎপত্তি। এছাড়া তাদের আর একটি গোত্রের নাম 'খিয়ংসা' বা 'খ্যংসা'। 'খিয়ং' বা 'খ্যং' শব্দের অর্থ হল নদী এবং 'সা' শব্দের অর্থ সন্তান। অর্থাৎ এই গোত্রের লোকেরা নদীতীরবর্তী জনপদবাসী। এরকমভাবে তারা বিভিন্ন পর্বত, নদী ইত্যাদির নামে তাদের গোত্রের নাম রাখেন। এই গোত্রসমূহের মধ্যে 'প্লেংসা', 'ক্যেয়ফ্রিয়াসা', 'রেংব্রিসা', 'প্লেংযিসা' ইত্যাদি আরো নানা গোত্রের নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ ত্রিপুরার পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বহু প্রাচীন কাল থেকে বাস করে আসছেন। পূর্বকথিত 'মগ' জলদস্যুদের সঙ্গে এদের এক করে না দেখলে তাদের এ রাজ্যে আগমন ঘটে আরো প্রাচীনকালে। একটি ঐতিহাসিক মত থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় রাজারা আরাকানের 'চেন্দ্রা' রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৫৪ সালে কুমিল্লার চারপত্রমুড়াতে চন্দ্ররাজাদের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তা থেকে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের পরিচয়ও জানা যায়। এ বংশের সাতজন নৃপতি দশম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত সমতটে রাজত্ব করে গেছেন। তাদেরই কোনও গোষ্ঠী ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের রাজ্যপাট বিস্তার করে থাকতেও পারেন। সাব্রুম ও বিলোনীয়া মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতিগোষ্ঠীর বাস। অনেক প্রাচীন জনপদ তাদের হাতেই গড়ে উঠেছে। আবার অনেক জনপদ থেকে তাঁরা সরে গিয়ে সেই জনপদকে শূন্য করে দিয়েছেন বা সে স্থান নতুন জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

সাব্রুম-বিলোনীয়া-শান্তিরবাজারের ছোটোখিল, দৌলবাড়ি, হরিণা, চালিতাছড়ি, বৈষ্ণবপুর, বিজয়পুর, ঘোড়াকাপ্পা, শিলাছড়ি, দেবদারু, জোলাইবাড়ি, পিলাক, বাইখোরা, লাউগাঙ, বীরচন্দ্রমনু এমন কি

ধলাই জেলার কুলাই প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মগদের ব্যাপক বসবাস লক্ষ করা যায়। এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন সর্বত্রই সুউচ্চ পাহাড়বেষ্টিত উপত্যকার মতো। এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে অবশ্যই একটি বা একাধিক জলধারা প্রবহমান থাকে। ত্রিপুরার প্রতিটি মগ অধ্যুষিত পল্লিতে এই সাদৃশ্য চোখে পড়ে। উর্বরা উপত্যকাভূমিতেই তাঁরা কৃষিজীবনের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। সমগ্র পল্লীপ্রকৃতিতে একটি শান্ত, সমাহিত নীরব পরিমণ্ডল বিরাজ করে থাকে।

ত্রিপুরা রাজ্যে মগরা যে বড়োদের অনেক আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন তার নিদর্শন রাজমালাতেই পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে 'হিমতি ফা' বা 'যুঝার ফা'-এর নেতৃত্বে ত্রিপুরীগণ বড়ো-কাছাড় এলাকা থেকে পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। এইসময় রাঙ্গামাটিতে 'লিকা' নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি মগ জাতিগোষ্ঠীর বলে জানা যায়। যুঝার ফা রাঙ্গামাটি আক্রমণ করে মগরাজাকে পর্যুদস্ত করে সেখানে রাজ্যপাট স্থাপন করেন। রাজমালা গ্রন্থে আছে—

'এই মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল।।'

(শ্রীরাজমালা – **১**ম লহর)

এরপর মগরা আরো দক্ষিণে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে সরে যান। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি বলে একটা স্থান এখনো আছে। সম্ভবত এই নামটি ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত মগগণ নতুন রাজ্যপাট স্থাপন করে অতীত স্মৃতিকে মনে রাখার জন্যই রাখেন।

যুঝার ফা-র আক্রমণে যে মগের পিছু হটে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়েছিল, তারা ধন্যমাণিক্যের পর বিভিন্ন সময়ে বারবার স্বীয় রাজ্য ত্রিপুরা পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ করেছে। অমরমাণিক্যের আমলে মগরা **১৫৮৪** খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজধানী উদয়পুর দখল করে নেয়। মগ সৈন্য উদয়পুরে পৌঁছে অবাধে লুটতরাজ শুরু করে দেয়। মগসৈন্যরা উদয়পুর বিধ্বস্ত করে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াটি ভেঙ্গে ফেলে। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্র দত্ত তাঁর 'উদয়পুর বিবরণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— যা রাজমালা থেকে উদ্ধৃত –

'সর্বকালে ত্রিপুরা যে মগেরে জিনিল।
অমরমাণিক্য কালে ত্রিপুর হারিল।।'

(রাজমালা)

পরবর্তী সময়ে কল্যাণমাণিক্য (**১৬২৬** খ্রিঃ – **১৬৬০** খ্রিঃ) ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটি সংস্কার করেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় উল্লেখ আছে –

‘কালিকার মঠচূড়া মঘে ভাঙিয়াছিল।
পুনর্বার মহারাজা নির্মাণ করিল।।‘

অমরমাণিক্যের পলায়নের পর মগরা সমগ্র দক্ষিণ ত্রিপুরা অঞ্চলে তাদের রাজত্ব কায়েম করে এবং ধীরে ধীরে তারা এই অঞ্চলে বসতি করতে আরম্ভ করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল মগ অধ্যুষিত হয়ে পড়ে।

মগ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ত্রিপুররাজের অনবরত সংঘাত-যুদ্ধবিগ্রহের পেছনে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। এই ঘটনাই পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বা স্থানীয় অনান্য জনগণের উপর মগদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান ইন্ধনের কাজ করেছে।

স্থানীয় মগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোকপুরাণ অনুযায়ী তাঁরা ত্রিপুরেশ্বরী মূর্তিকে তাঁদের দেবী বলে ক্ষীণ দাবি করে থাকেন। তাঁদের হাতে প্রামাণ্য কোনও তথ্য না থাকায় কিংবা ত্রিপুরার মগজাতির সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস সংগৃহীত না হওয়ায় তাঁদের বংশ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত মিথ ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। তাদের লোকপুরাণে আছে যে ত্রিপুরার রাজা তাঁদের দেবী ‘মগেশ্বরী’-কে চট্টগ্রামের সদরঘাট অঞ্চল থেকে চুরি করে এনে উদয়পুরে স্থাপন করেছেন। সে সম্পর্কে রাজমালায়, গবেষকের আলোচনায় ও ত্রিপুর বংশাবলী নামক প্রাচীন গ্রন্থে তিনটি ভিন্ন সিদ্ধান্তের উল্লেখ পাই। রাজমালায় আছে—

‘আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল,
বাস্তুপূজা সংকল্প বিষ্ণুপ্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমায় স্থাপ রাজা মহাসত্ত্বে।।
চাটিগ্রামে চটেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথ্য হতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেইমতে ভজ।।
(শ্রী রাজমালা)

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধন্যমাণিক্য রসাঙ্গমর্দনকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মিত মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির নিষ্ঠাবান গবেষক ডঃ রঞ্জিৎ দে তাঁর গ্রন্থে চট্টগ্রামের যে স্থান থেকে ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্তিটি সংগ্রহ করা হয়, তার উল্লেখ করেছেন—'ত্রিপুরার প্রধান তীর্থস্থান জাতি উপজাতির মিলনকেন্দ্র ত্রিপুরেশ্বরীকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী বারককুণ্ড থেকে ত্রিপুরার মহারাজা ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে নিয়ে যান। এখনও সীতাকুণ্ডের সন্নিহিত তীর্থস্থান হিসাবে ত্রিপুরাসুন্দরীর নাম উল্লেখযোগ্য''। (রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম, ডঃ রঞ্জিৎ দে, পৃঃ ১৩)।
এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ত্রিপুরেশ্বরী বিগ্রহের প্রাপ্তির উৎস হিসেবে রাজমালা ও ডঃ রঞ্জিৎ দে-র প্রবন্ধে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।
এদিকে, ত্রিপুর বংশাবলীতেও এবিষয়ে একটি স্পষ্ট তথ্য দেওয়া আছে—

'রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরম্ভিল।
চট্টেশ্বরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাইল।
এমঠে আমাকে রাজা করহ স্থাপন।
নতুবা অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন।।
এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর।
তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।।
চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষমূলে।
পূজয়ে আমারে সদা মগ সকলে।।
সেই স্থান হতে শীঘ্র আনহ আমায়।
(ত্রিপুর বংশাবলী)

এখানে ত্রিপুরেশ্বরী যে মগপূজিতা দেবী সে বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মগদের লোকশ্রুতির কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য এখানে পাওয়া যায়।
এছাড়া ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব গবেষক প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি দেবীর যে আঙ্গিক বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেবীকে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভূত মানুষের মতো চোখ ছোটো, নাক চ্যাপ্টা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে আরণ্যক মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মূর্তিতত্ত্বানুযায়ী ত্রিপুরাসুন্দরী নন বলে দাবি করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ একজটা দেবীর সঙ্গে হিন্দু 'তারা' দেবীর মিল আছে। বৌদ্ধ ডাকিনীর মূর্তিও হিন্দু চামুণ্ডার অনুরূপ। এছাড়া শবরদেব পূজিতা তিন নামে পরিচিত শবরী, পর্ণশবরী, নগ্নশবরী ও বৌদ্ধগণ কর্তৃক 'জাঙ্গুলি তারা' নামে অর্চিতা। ইনি দিগ্‌বসনা। মহাযানী বৌদ্ধমতে ইতি

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর-এর পত্নী। পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা আক্রান্ত হলে বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হন। এই সংমিশ্রণের-বিমিশ্রণের ইতিহাসগত স্বীকৃতি তো রয়েছেই।

[শেষাংশ আগামী সংখ্যায়]

সূচিপত্র

ঈশানকোণ

ছোটগল্প

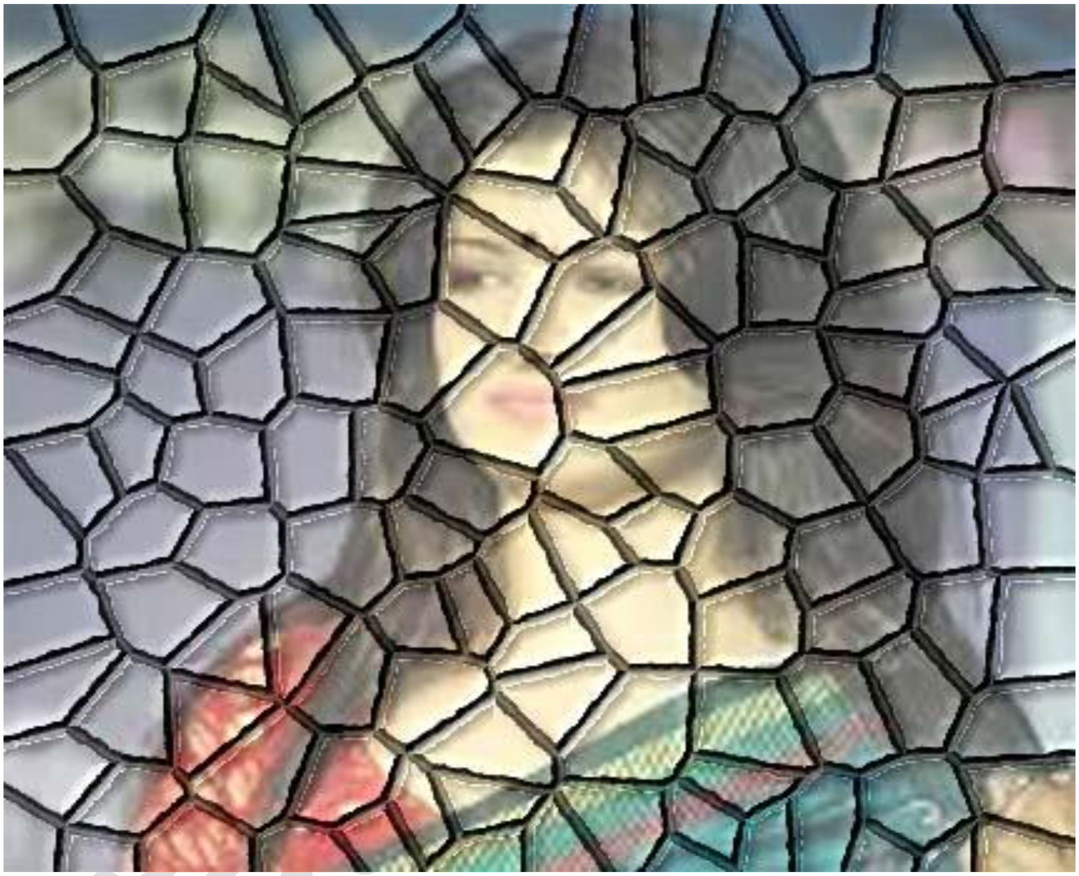

বীজমন্ত্র

বিশ্বদীপ দে

গতকাল রাত্রেই আমার মারা যাওয়ার কথা। এইসময় আমার নিথর দেহটা শুয়ে থাকার কথা মর্গের শীতল অন্ধকারে।

আজ একটু আগেই জানতে পারলাম ব্যাপারটা। যখন সম্রাট ওর বাইকের হেলমেটটা দেখাল, দেখেই চমকে উঠলাম। কীরকম অদ্ভুত ছেঁচড়ে গেছে। ওঃ ! মুহূর্তে স্পষ্ট দেখতে পেলাম দৃশ্যটা।

দ্রুত বেগে বাইকটা এগিয়ে আসছে। চালক মদ্যপ সম্রাটের পিছনে বসে আছি আমি। নেশার ঘোরে বাম্পারটা বুঝতে পারল না সম্রাট। ছিটকে গেল বাইকটা। বাইক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম আমি। সম্রাট বাইকসুদ্ধ এগিয়ে গেল সামনের দিকে। হেলমেট থাকায় কোনও ক্ষতি হল না ওর। স্কিট করে বেশ কিছুদূর হিন্দি ছবির নায়কের মতন গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল ল্যাম্পপোস্টে। লোকজন ছুটে আসছে আশেপাশের দোকান থেকে। একটু দূরে আমি। তখনও কি গোঙাচ্ছি একটু একটু, নাকি......।

ওঃ। বিরাট ফাঁড়া গেছে। ভাগ্যিস তুই দাঁড়াস নি তন্ময়। সত্যিই তাই। অথচ অন্যদিন হলে আমি হয়তো দাঁড়িয়েই যেতাম। কাল যখন সম্রাট ফোন করে বলল, 'সে কীরে তারাতলায়! দাঁড়া দাঁড়া, আমি আসছি'। সত্যিই বেশ কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। মনের অবস্থা এমন যে একা থাকতেই ইচ্ছা করছে অথচ পকেটের অবস্থা ভাবলে দাঁড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। সম্রাটের সঙ্গে যাওয়া মানেই অটোর ভাড়াটা, মানে ছ'টাকার সাশ্রয়। মাসের বাইশ তারিখ ছ'টাকার মায়া বড় কম নয়। কিন্তু একা থাকবার ইচ্ছেটা এতই প্রবল ছিল শেষ অবধি না-ই করে দিয়েছিলাম, আরে আমার অটো এসে গেছে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি ...

সম্রাট বাইকে স্টার্ট দিয়ে বলল, নে এবার বস। ভয় নেই। আজ আমি একফোঁটাও খাইনি। আর আমরা তো ক্লাব পর্যন্ত যাব। জাস্ট দু'মিনিটের পথ। চলে আয়।

--- নারে, আমি ক্লাবে যাব না। একটু নিরুপমদের বাড়ি যাব।

কথাটা শুনেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল সম্রাট, 'তুই বোধহয় আর কোনওদিনই বাইকে চড়বি না। আবে গাণ্ডু এই দ্যাখ পিছনের হেলমেট। তুই না হয় পরেই নে শালা ডরপোক। হেলমেট থাকলে তো আর...

--- আমি ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

--- দূর শালা। থাক তুই। আমি বেরিয়ে গেলাম। বহুৎ টায়ার্ড লাগছে। একটু পুরিয়া না খেলে...

মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে গেল সম্রাট। আর আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ক্লাবে সম্রাটের অনেক চ্যালা চামুণ্ডা আছে। এই দামি চাকরিটা পাওয়ার আগে অবধি যারা সম্রাটকে পাত্তাই দিত না সেভাবে, এখন সেইসব পরজীবীগুলো সম্রাটকে আঁকড়ে ধরেছে। গাঁজা, মদ এসবের যোগানদার সম্রাট এদের ঈশ্বর হয়ে উঠেছে। আমি পাড়ার ভেতর না ঢুকে রাস্তাটা পার হয়ে এলোমেলো হাঁটতে লাগলাম। এক্ষুনি বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আজ তো একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছি অফিস থেকে। অন্য সময় হলে ক্লাবে গিয়ে একটু ক্যারাম পিটিয়ে আসা যেত। কিন্তু ইদানীং আর ক্লাবে যাওয়া যায় না। গাঁজা-মদের দূরন্ত আসর জমে প্রতিদিন।

সম্রাটের সাথে আজ আর দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হত। তাহলে কাল রাত্রের দুর্ঘটনার কথাটা জানতে পারতাম না। পরে আবার যখন দেখা হত তখন আমি হয়তো ব্যাপারটাকে সাধারণভাবেই

নিতাম। কিন্তু আজ, যখন জানতে পারলাম কাল ওর বাইকে চড়লে মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কেমন অদ্ভুত সব অনুভূতি হচ্ছে। প্রথম যখন শুনলাম একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি নেমে গেছিল মেরুদণ্ড দিয়ে। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে অনুভূতিটা পাল্টে যাচ্ছে। এখন কেমন যেন একটা আফশোস হচ্ছে। এবং তত আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি পালাবার কথা ভাবছি ?

খুব ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমি তখন ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ি। আমাদের কুয়োতে একটা বেড়াল পড়ে গিয়েছিল। কুয়োর ভিতরে গজিয়ে ওঠা গাছপালাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছিল প্রাণপণে। বাবা বালতি নামিয়ে দিয়েছিল কুয়োর ভিতর। যাতে সেটাকে ধরে উঠে আসতে পারে বেড়ালটা। কিন্তু বেড়ালটা কিছুতেই বালতিটার ওপর উঠতে পারছিল না। যতবার চেষ্টা করছে, ততবার পিছলে যাচ্ছে। আর আমরা চমকে চমকে উঠছি। ভয়ে আমাদের বুক হিম হয়ে যাচ্ছিল। শেষমেশ বেড়ালটা সফল হল। কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে ঝুপ করে লাফ মারল মাটিতে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল বেড়ালটা। বোধহয় ওর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝে নিচ্ছিল কী বিরাট ভাগ্য ওর। সেই থেকে দৃশ্যটা আমার মগজে গেঁথে গেছে। ‘মৃত্যু থেকে ফিরে আসা’ বলতে এই দৃশ্যটাই আমার মনে এসেছে এতকাল।

বেঁচে যাওয়ার পর বেড়ালটার যে অনুভূতি হয়েছিল তার একটাই নাম। সুখ। প্রবল সুখ। এবং এখানটাতেই আশ্চর্য ... আমার কোন অনুভূতি হচ্ছে না। যদিও আমার সরাসরি অভিজ্ঞতা হয়নি তবু ... । কেন বারবার মনে হচ্ছে, যদি কাল দাঁড়িয়ে যেতাম তারাতলায়। যদি অপেক্ষা করতাম সম্রাটের জন্যে। রাস্তার ধারে আমার পড়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহটার প্রতি হিংসে হচ্ছে। এবং একটু আগে মনে আসা কথাটার গা থেকে আমি একটু একটু করে প্রশ্ন চিহ্ন মুছে ফেলছি। না, কোনও সন্দেহ নেই, আমি পালাতে চাইছি। জীবনের কাছ থেকে, হয়তো বা নিজের কাছ থেকেও।

হ্যাঁ, তিয়াসা আমার মনের কথাটা জানতে পারলে আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করবে। সে একা একা একটা লড়াই চালাচ্ছে, তাও প্রত্যক্ষভাবে, আর আমি? এতদূর থেকে একটা পরোক্ষ যুদ্ধ করতে গিয়েই পালাবার কথা ভাবছি! ঠিকই। তবু চিন্তাটা বোধহয় অমূলক নয়। কাল যদি আমি মারা যেতাম তাহলে তিয়াসা ধ্বংসের মুখোমুখি হত একথা সত্যি। কিন্তু শেষমেশ হয়তো এতে ওর ভালোই হত। ওদের সবার। তিয়াসা, তিয়াসার বাবা, মা।

তিয়াসার বাবা কাল আমায় ফোন করেছিলেন। তাঁর অফিস থেকে। আমিও তখন অফিসে। সরাসরি বলেছিলেন, দেখো, লাভ ম্যারেজ তো কতই হচ্ছে। আমিও আপত্তি করতাম না। কিন্তু ... প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, তোমার চাকরিটা ...! তারপর ঠাণ্ডা, আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল তাঁর কণ্ঠস্বর, তোমাদের সম্পর্কটা তোমরা এখানেই শেষ করে দাও। আমি তিয়াসাকেও একথা বলেছি। তোমাকেও একথা জানিয়ে দিলাম। মার্চ মাসের গরমেও আমার কাঁপুনি দিয়ে শীত করছিল। তিয়াসার বাবার ধাতব শীতল কণ্ঠস্বর চকিতে যেন ফোন থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা ধারালো অস্ত্র হয়ে। আর আমার

কণ্ঠনালিতে আলতো করে চাপ দিচ্ছিল। দু-এক ফোঁটা অদৃশ্য রক্ত গড়িয়ে এসে আমার শার্ট ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমি প্রচণ্ড ঘামছিলাম।

তিয়াসা ফোন করেছিল সন্ধেবেলা। অফিস থেকে তখন ফিরছি। ওর কান্নাভেজা স্বর – আমি আর পারছি না গো। খুব দ্রুত আমাকে বোবা করে দিয়েছিল। তিয়াসা আরও অনেক কথা বলেছিল, ওর বাবার রাগের কথা। মায়ের কান্নার কথা। ওর অসহায়তার কথা। একাকিত্বের কথা, অস্থিরতার কথা। কিন্তু সেসব কথা না বললেও চলত। 'আমি আর পারছি না গো' তিয়াসার এই একটা কথাতেই আমি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। কোনওদিন ওদের বাড়ি যাইনি। কিন্তু ঐ একটা কথাতেই আমি ওদের বাড়ির ভেতরটা দেখতে পেয়েছিলাম। তিয়াসার মায়ের শূন্য দৃষ্টি। গালে শুকনো কান্নার দাগ। ওর বাবার অনমনীয় মনোভাব ও অসহায় পায়চারি। একটু দূরে, হয়তো বা খাটের ছত্রি ধরে তিয়াসার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা।

আসলে তিয়াসার জন্মের মুহূর্ত থেকে এ বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উড়ে বেড়িয়েছে একটা স্বপ্ন। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত যোগ্য মানুষের স্বপ্ন। তিয়াসার সমস্ত দায়ভার থাকবে যার হাতে। ছোট্ট তিয়াসা একটু একটু করে বড় হয়েছে আর ধীরে ধীরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে সেই স্বপ্ন। আজ যখন এ বাড়িতে শুধু স্বপ্নটাই এক এবং একমাত্র স্বপ্ন, তখন হঠাৎ সেই স্বপ্নের ডানা মুচড়ে গেছে। আহত পাখির মতন তার লুটিয়ে পড়া ছায়া এ বাড়ির সব আলোকে যেন মুহূর্ত ঢেকে দিয়েছে।

রাত বাড়ছে। আমাদের এদিকটা সদ্য কলকাতা পিনকোড জোগাড় করেছে ঠিকানায়। কিন্তু আসলে এখনও মফস্বলই রয়ে গেছে। রাত দশটার পরই রাস্তাঘাটে লোকজনের চলাচল অপেক্ষাকৃত কম। হ্যালোজেনের ঘোলাটে আলোর ভিতর হাঁটছি। চূড়ান্ত বিষণ্ন একটা রাত আমার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

আরো বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আমার কেমন লজ্জা করতে লাগল, ছিঃ! তিয়াসাকে কি আমি অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভাবছি। তিয়াসা, যে মেয়েটা তার বাড়ির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে, তীব্র লড়াই – আমার সামান্য চাকরির সামান্য বেঁচে থাকার সাথে যুক্ত হতে চাইছে, অন্তত অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকার সম্ভাবনাগুলোকে অগ্রাহ্য করে – আমি তাকে ছাড়তে চাইছি! তাকে! না, না। নিশ্চয়ই আমি তা চাইছি না। শুধু ভাবছি, মৃত্যু যদি কাল সরিয়ে দিত আমায়, তাহলে কী হত! আসলে কাল তিয়াসার ফোনটার পর থেকে একটাই চিন্তা মাথায় ঘুরছে আমার। আমার জন্য, শুধু আমার জন্য কতগুলো মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। হয়তো তাই মৃত্যু আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমাকে ফোন করছে, সম্রাট নয়, কালো চাদর পরিহিত একটা ভয়ঙ্কর কঙ্কাল! মৃত্যু! বারবার অনুরোধ করছে দাঁড়িয়ে থাকতে। সে আসবে... ।

বাড়ি ফেরার পথে শুনতে পেলাম কেউ একজন ক্লাবের সামনে বসে জোরে জোরে গাইছে। গলা শুনেই চিনতে পারলাম, প্যাঙ্কা। আমাকে দেখেই ডাকল, 'অ্যাই তন্ময়, শুনে যা'। প্যাঙ্কাকে আমি

আজকাল মানুষ তো দূরের কথা প্রাণী বলেও ভাবিনা। ক’দিন আগে পাড়ারই একটি মেয়ের স্নান করার দৃশ্য লুকিয়ে দেখতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। এখন একটু সেরে উঠেই আকণ্ঠ মদ গিলে বসে আছে। আমি চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম সম্রাটের গলা, অ্যাই তন্ময়, শোন না।
গিয়ে দেখি ক্লাবের সামনে অন্ধকারের ভিতর আরও অন্ধকার হয়ে বসে আছে প্যাঙ্কা আর সম্রাট। সম্রাট ছোট্ট একটা কাঁচি দিয়ে গাঁজার পাতা কাটছে যত্ন সহকারে। বলল, কী হয়েছে তোর?
--- কী হবে।
--- মালের সাথে বাওয়াল হয়েছে? দ্যাখ একটু আগেই যখন দেখা হল সন্দেহ হচ্ছিল। আর এখন তোর হেঁটে যাওয়া দেখে আই অ্যাম সিওর, কুছ তো হুয়া হ্যায়।
--- আমি বাড়ি যাচ্ছি।
--- আরে দাঁড়া না। একটু বসে যা, জানিস প্যাঙ্কা, তন্ময়ের গার্লফ্রেন্ডটাকে হেভী দেখতে। আমি দেখেছি।
তাই শুনে প্যাঙ্কা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল, ‘আরে বাওয়া, লাইন মারলে ওর’ম একটু আধটু...’
প্যাঙ্কা এই পর্যন্ত অসংখ্য প্রোপোজ করেছে। বলা বাহুল্য কেউই পাত্তা দেয়নি। প্যাঙ্কারা ভাড়া বাড়িতে থাকে, প্যাঙ্কা গোডাউনে কাজ করে, ওর চেহেরা কালো, শীর্ণকায়, পাড়ায় ভীষণ বদনাম – নাকচ করার অনেক যুক্তি মেয়েগুলি দেখিয়েছে। শেষমেশ প্যাঙ্কা মেয়েদের বাথরুমে উঁকি মারা শুরু করেছে।
সম্রাটের সমস্যা অন্য। সে হ্যান্ডসাম, স্মার্ট। মেয়েদের অভাব তার কোনোদিনই হয়নি। কিন্তু সেই যে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে সুপর্ণা নামের মেয়েটা ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ পর্যন্ত ও সেই আঘাতটা সামলাতে পারেনি। ফুর্তির প্রয়োজনীয়তা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে মিশবার মতন কারণ সে খুঁজে পায় না তারপর থেকেই।
সম্রাট এবার বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, ‘তন্ময়, এইসব ন্যাকাপনা ছাড়। নইলে শুধু শুধু কষ্ট পাবি। মেয়েরা শুধু ...’
সমাজের হিসাবে সম্রাট আর প্যাঙ্কা দু’জন ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। কিন্তু একটা দিকে দুজনের ভীষণ মিল। ভালোবাসার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ওরা। এও কি এক ধরনের মৃত্যু নয়! গাঁজার কটু গন্ধের ভিতর থেকে কি ওদের শবদাহের গন্ধই ভেসে আসছে না? বললাম, তোরা ভুল ভাবছিস। ভালোবাসা জীবনেই না’ই থাকতে পারে। কিন্তু ভালোবাসার ওপর বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলাটা আমার মতে...
--- দোর শালা জ্ঞান মারাচ্ছিস?

সম্রাট চেঁচিয়ে উঠল, খুব ভালোবাসা দেখাচ্ছিস না?
ঠিক এই সময় ফোন বেজে উঠল। তিয়াসা। কান্নাভেজা আবেগময় স্বরে বলল, কাল একবার দেখা করতে পারবে? লাইব্রেরী যাওয়ার নাম করে আসব। সাড়ে ন'টা নাগাদ। তোমায় দেখতে এত ইচ্ছে করছে...

কেন জানিনা চোখে জল চলে এল। বললাম, আসব।

--- তোমার অফিস...

--- সে ম্যানেজ করে নেব।

আমি এখন বাড়ির পথে। আকাশ দিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছে। তিয়াসাদের বাড়ি এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। ওদের বাড়ির খুব কাছ দিয়ে প্লেন যায়। এই প্লেনটার কি এখন ওদের বাড়ির খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে? প্লেনটার দিকে দেখতে দেখতে বললাম, আমাকে ক্ষমা করে দিও তিয়াসা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমায়। তুমি ছাদে, জানালায় অথবা ব্যালকনিতে। আমাকে খুঁজছ। আর আমি পালাবার কথা ভাবছিলাম! আমার নিজের উপর ঘেন্না হচ্ছে তিয়াসা। আমি এখন বুঝতে পারছি কাল আমাকে মৃত্যুর নাগাল থেকে আসলে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমাদের ভিতরকার চার অক্ষরের এক অমোঘ সম্পর্ক। কী আশ্চর্য! আমি এতক্ষণ তাকেই অবহেলা করে চলেছিলাম সবচেয়ে বেশি। তবে কি বাস্তবের ঠোক্কর খেতে খেতে কোনও এক বিন্দুতে জন্ম নিচ্ছিল সংশয়! মারণরোগের মতন যা এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারত সর্বত্র। প্যাঙ্কার মতো, সম্রাটের মতো তবে কি আমিও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম? আমিও কি মারা যাচ্ছিলাম ওদের মতো ... তিয়াসা? আমি ... আমি কেন ভুলে যাচ্ছিলাম বেঁচে থাকার সেই বীজমন্ত্রের কথা ... ভালোবাসা ... ওঃ তিয়াসা! আমি আবার বেঁচে উঠছি ... এই দ্যাখো ...

সূচিপত্র

অণুগল্প

প্রেতসময়

ব্রতীন বসু

(১)

জানুয়ারি মাসের রাত নটা। লিটল ম্যাগাজিন মেলা চলছে। খুব বেশি লোক নেই আর নন্দন চত্বরে। চল, এবার ফেরা যাক। আর কি করবে থেকে। আর নেই একটাও। সব শেষ হয়ে গেছে। অবিনাশ বাবুর হাতটা হালকা করে চেপে ধরলেন সুনন্দা।

হ্যা চল। দেখ এবারেও সবাই রেখাকে ভালবেসে নিয়েছে। পঁচিশে পা দিল আমাদের রেখা।

কি সুন্দর দেখতে হয়েছে তাই না?

সুনন্দা অবিনাশবাবুর চোখের দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল।
ডাক্তার বলেছেন, কিছু করার নেই। আস্তে আস্তে কমে যাবে।
শব্দরেখা। অবিনাশবাবুর শুরু করা ম্যাগাজিন। আদর করে ডাকতেন রেখা বলে।
চার বছর হল অর্থাভাবে বন্ধ। একদিন ঝোঁকের মাথায় কাগজওয়ালা ডেকে চার টাকা কিলো দরে সব বিক্রি করে দিতে হয়েছে।
তারপর থেকে প্রত্যেক বই মেলাতে প্রত্যেক নতুন গল্পে কবিতায় অবিনাশ বাবু রেখার অস্তিত্ব খুঁজতে আসেন। খুঁজে পান।
প্রেত সময়।

(২)

ঘর গোছাতে গোছাতে আলমারির গোপন তাক থেকে গোলাপকাঠের বাক্সটা বেরিয়ে এলো।
অনেক বছর আগেকার সেই দিনটা মনে পড়ে গেল রুবাইয়ের।
তোর নাম দিলাম সবজান্তা। তুই আমার সবটুকু। তোকে কোনদিন খুলবো না। আমি চাই না দুষ্টু হাওয়া জেনে ফেলুক আমাকে।
ভুলেই গেছিল রুবাই ওটার কথা। এতোদিন বাদে হঠাৎ করে হাতে পেয়ে ভাঙতে ইচ্ছে হল পুরোনো দেওয়া কথা। একবার খুলে দেখলে কি হবে।
না থাক।
মনের ক্যানভাসে দেখে নিলেই হবে। সেই একটা অচল এক হাজারের নোট। জল ছাপের জায়গাটায় একটা কাঁপা হাতের সই। মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার পর পাওয়া। দিদার দেওয়া শেষ উপহার। আমার শ্রদ্ধার শব্দকোষ।
সেদিন সারারাত দিদার সাথে কথা বলেছিলাম।

ভোরের দিকে টুকটুকি এসে ঘুম ভাঙালো, মামদাদু আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে। স্টার পেয়েছি। কি দেবে?
আমি নতুন দু হাজারের নোট দিলাম, কি করবি এটা নিয়ে?
আমার কৌতূহল, লিখে দেব কিছ এতে?
আইনক্স সলমন খান পিজ্জা আরো কত কি বলল টুকটুকি। আমি তাকিয়ে রইলাম আমার হস্ত শিল্প মেলা থেকে কেনা গোলাপকাঠের বাক্সটার দিকে।

প্রেত সময়।

(৩)

ছোঁস না।
ছোঁস না।
এই যা!!
ছুঁয়ে দিলি তো।
আবার স্নান করতে হবে এই অবেলায়।

পিসিমারা আজকাল পরিচারিকা নিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাটে থাকেন।
শনি মঙ্গল একাদশী সগড়ি অরন্ধন অষ্টমী সবাই অন্ধকারে।
প্রেত সময়।

(ভবিষ্যৎ)

ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। না থাকার অশরীরী তালিকাটাও।

সূচিপত্র

কবিতা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের চারটি কবিতা

রাতে লেখা কিছু টুকরো

১
বিছানায় ছানা জড়িয়ে থাকতে থাকতে
চাঁদ ডাকি চুলের রাস্তায়
আকাশে বাবার ছবি
আমাতে ছায়া দেয়

ঘুমের ঘরে যামিনী রায়ের গণেশ .
২
কুঞ্জভঙ্গের পর শূন্যতা
ছেঁড়া গাঁদার মালা নিয়ে
এই অসহায় দেবতাকে
বড়ো নিজের মনে হয়
কীর্তন বাজতেই থাকে ভিতর যন্ত্রে
কৃষ্ণও
৩.
রাতের গাছটি দেখি আর আনন্দকে
তার দু বাহুর ভিতরে
পাখি আর পাখির বাসা নিয়ে
আরাম বাতাস পাতায় পাতায়
তারাদের ফোটায় আর গাছটিকেও

নীল বোতাম খুলে হাসছে জানালা

রাধা হয়ে আছে সন্ধ্যার শরীর। পাড়াকে কীর্তনে পেয়েছে। করতাল
আর খোলের যুগলবন্দী আকাশকে একটি গৌরচন্দ্রিকা দিল। রাগ আগে
পূর্ব পেলে মেঘেও কৃষ্ণ দর্শন

বাঁশির ঘুম ভেঙে গেলে রান্না পুড়ে যায়। পেখম পাবার আগে ময়ূরটি খুঁজি। প্রেমের শীতল কলসটি গ্রীষ্ম চায়। কলঘরে ঝরে যাচ্ছে রজস্বলার
কান্না। দেবতাটিকে তবে কী দেবে!
সুদর্শন নাকি পাঞ্চজন্য!

ব্রজের ধূলির ভিতরে গোঁসাই গোপী হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গ। একাকী। মন্থর সময়। অতুল প্রসাদে ডোবে। রজনীকান্ত পায়। পা পা করে চলে যাচ্ছে গোপাল। রাত্রি কখন পরমোৎসব

শবের ভিতরে ভালোবাসা বসে উচ্চারণ করছে নতুন বাসার খবর

ফিরে ফিরে যমুনা ও তমালে

রাধামাখা সন্ধ্যা। কীর্তন গুছিয়ে নিচ্ছে মালা ও চন্দন। খোল কর্তালে
রসকলি আঁকা হলো। আখর দাও
এই রাত্রির অভিসারে। বাঁশিকে দেখি
কৃষ্ণ আর পূর্বরাগে

পরাগমোচন শব্দটি ফুলের সম্পর্ককে
অবৈধ ভাব দেয়। ভাবনাকে না বলতে পারি না বলেই সে অবাধ্য।
লক্ষণরেখাটি পেরোলেই পরকীয়া।
নোলক ভেঙে যায়

গৌর অঙ্গ চোখের আরাম দেয় পদটির সাথে। চন্দ্রিকাও ছড়িয়ে পড়ে। পাড়াটি ধীরে ধীরে উর্ধ্ববাহু হয়। সংসারের রন্ধন পুড়ে যায়
বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরতায়

তর্জা ও যুদ্ধের শেষে ফুলের সুবাসে প্রেম কুঞ্জভঙ্গের পর মাথুর রেখেছে

হে রহস্যময়ী

দুপুরের কাছে ধূ ধূ ঋণে পড়ে যাই
আকাশ অবাক লেখে
মুন্নি বিবির গরু হারিয়ে গেলে
একটা চাপা কান্না জল খুঁজে ফেরে
গাছ তার ছায়ায় ডেকে নেয়

ক্লান্ত পাতা আর ডালের নীচে
চৈত্র মাস ঘুমিয়ে পড়লে
মৃত আত্মীয় আসে
কিছুক্ষণ স্বপ্নে বেড়িয়ে আসা

শুকনো কুয়োয় পড়ে থাকা
ভালোবাসার লাশে
শরীর দিয়ে
ভালোলাগা বিকেল ফেরে

সূচিপত্র

কবিতা

জেদ

প্রতিমা রায় বিশ্বাস

একটি মেয়ে গুটি গুটি পায়ে বসন্তের উৎসবে আসে, প্রতিবছর।
অবগুণ্ঠিত হাত দুটি শঙ্খলাগা সাপের মত বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নৃত্যে মগ্ন হয়, পলাশের লালে।
দিনের থেকে হলুদ চুরি করে লাগিয়ে দেয় আজও তোমার বিরোধী গালে।
তখনই পড়ে থাক সব সাধের সংসার। পড়ে থাক ঘুণে খাওয়া জৈবিক প্রেম।
ডাকে ঐ ঐতিহ্য।
এত মায়ার ঐ সংস্কৃতির টান।

রবীন্দ্রনৃত্যে এখনও তার বেসামাল শাড়ি, খসে-পড়া কোমরে দেবীরা আসে, অপ্সরা, উর্বশী।
ইতিহাস থেকে গার্গী আসে মৈত্রেয়ী, সংঘমিত্রাও।
ফাগুনের ফুল চুলে গুঁজে আজও শকুন্তলা যেন তুমি।

জ্যাহেরা এই তো রক্তের টান।
ভালোবাসাই মহার্ঘ জীবনের করেছো প্রমাণ
দিয়ে সব জলাঞ্জলি,
তবু প্রেম অতীত বর্জন করে ....
ফাল্গুন আজ তাই উদাস, তোমার ঐ রঙ করা মুখে।
প্রেম অতীত বর্জন করে....
তোমার চোখে আজও তাই, না হারানোর অতীত-জেদ।
এ জেদেই জ্যাহেরা; বৈচিত্র্য এসেছে ভারতে।
নিজের গালে নিজেই রঙ লাগিয়ে জ্যাহেরা, তুমি....
এঁকেছো অজান্তে মানচিত্র, গণতন্ত্র ভারতের।

সূচিপত্র

কবিতা

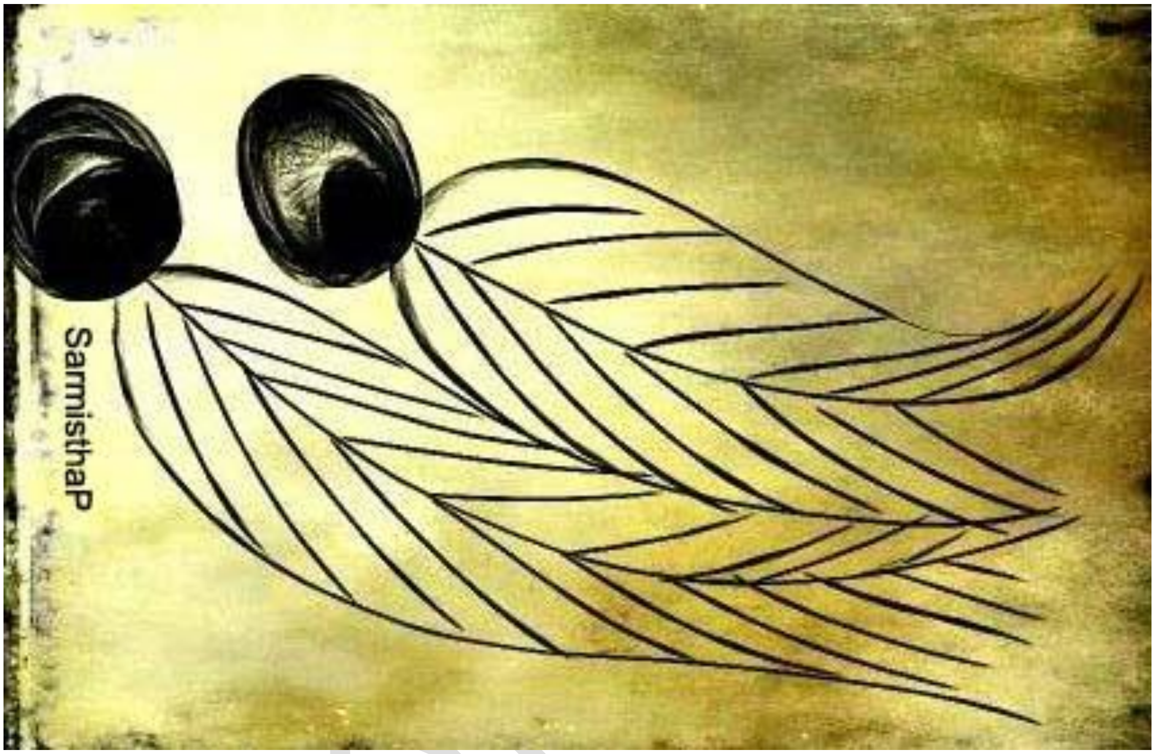

কুমারেশ তেওয়ারীর কবিতা

খাম্বাজ রাত্রিতে

নিরালম্ব হয়ে বসে থাকার মধ্যেও একটা
উন্মাদনা আছে। যেটি গোপনীয় হলেও
তার চাকাগুলি কিন্তু খুব পল্লবকাতর।
আর দোষ কোথায়। একটি মৃতদেহকেও
যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার শেষ ইচ্ছে,
সেও হয়তো বলে উঠতেই পারে

কাস্পিয়ান সাগরের ঢেউয়ে ভাসতে
ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরীদের নৃত্য দেখতে পেলে
সে প্রয়োজনে নিজের হাতেই খুলে ফেলবে
নরকের দ্বার। যেখানে কড়াইয়ে ফুটন্ত তেল
তাও আচ্ছা। শুধু তার আগে যেন আশ্রমের
গং শব্দটি শুনতে দেওয়া হয় খাম্বাজ রাত্রিতে।

অপ্রকাশিত

মেঘের ভেতরে যে জলীয় বাস্প থাকে
তার সঙ্গে আমি তুলনা করতে চাই
নারীর ভেতরে থাকা মনস্তত্ত্বের

মেঘেদের যেমন চাকা থাকে এবং গড়িয়ে গড়িয়ে
চলে যেতে পারে বিষণ্ণ কোনো পানশালার দিকে
জলীয় বাস্প ঢেলে ধুইয়ে দিতে পারে
তার দু-চোখের পাতা

নারীরাও যে কোনো শীতের দুপুরে
ছাদের উপরে বসে দেখতে থাকে লক্কা পায়রার উড়াল

কিছুটা উপরে উড়ন্ত চিলের ছায়া দেখে
তারা কিছুতেই ঠিক করতে পারে না
কোন স্কেলে গেয়ে উঠবে অপ্রকাশিত গান

আদিম

একটা চিরুনির গোপন কথা জানতে চেয়ে
কান পাতলেই তার দাঁড়ে
একই সাথে শুনতে পাওয়া যাবে
চুড়ির রিনিঠিনি আর ঘোড়ার হ্রেষণ

খুব তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির অধিকারী কেউ
শুনতেও পারে চিরুনির ভেতরে গলে গলে
পড়ছে মোম
আর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে গলনাঙ্ক

এসময় রেফ্রিজারেটরের ভেতর থেকে
কপাট খুলে বেরিয়ে আসা কোনো পেঁয়াজ নাচতে নাচতে তার গা থেকে পোশাক খুলে ফেলতে ফেলতে
দেখাতে চাইবে শল্কমোচনের প্রক্রিয়াটি
সেই আদিমই রয়ে গেল আজও

উন্মোচন

খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দুজন বৃদ্ধ
কাকে অভিবাদন জানাতে টুপি খুলে
ওড়াচ্ছিল বিকেল বাতাসে
তা জানার কথা ছিলোনা
পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা নাঙ্গা গাছটির
শুধু বহু দুরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে
পাহাড়ে উঠতে থাকা সূর্য
হয়তো জানতো সব গোপনীয় কথা

তেরচা আলোয় তার অবিমিশ্র ছায়া
ভারী করে তুলছিল পাহাড়ের ক্লান্ত সানুদেশ
বহু নীচে মনোরম মেপল রাস্তায়
ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে তুতেনখামেন!

ঢেউ

জালতন্ত্র ওই টপকালো কুমুদবাগান
তারপর ধুমপাঁচিল পেরিয়ে রাইজানালা
সারাদিনের রোদালা মাখা পর্দায়
লেগে থাকা আলফাজ লাফিয়ে উঠতেই
বাঁশি আমোদ গুনলো আপাতত আর
শুনানির ভয় নেই
এখন তরণীও চাইছে প্রমোদভ্রমণ

সুচিপত্র

ছোটগল্প

সরীসৃপ

সদানন্দ সিংহ

এক

দুটো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। সামনে আমি। আই বাপ, সাপেরা কি অত উঁচুতে মাথা তোলে! কাটা জিভ দুটো হি-স-স করে বের হয়েই ঢুকে যাচ্ছে। হি-স-স করে যেন বাতাস কাটছে, মুখ শুকিয়ে গেলে যেমন হয়। যেমন আমার।

আসলে আমি সাপ-টাপ একদম ভয়ই পাইনা। এইসব কাটা জিভে আমার ভয় করেনা। কতোবার আমার পায়ের ওপর দিয়ে সাপেরা চলে গেছে। এবড়োখেবড়ো চিহ্ন রেখে। আমার কিছুই হয়নি। ঐ যে, আমার ভয় করেনা। আর ভয় করে কোন্ শালারই বা লাভ?

আরো মাথা তুলে দাঁড়ায় সাপ দুটো। হি-স-স করে জিভ বের করে। সত্যি বলতে গেলে সাপ-টাপগুলোও আমাকে কিছুই করেনা। হয়তো সাহসই পায়না। কতোখানেই কতো সাপের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ওরা আমার দিকে চেয়ে থাকে। আর ফণা তোলে। তারপর সুড়সুড় করে একসময় চলে যায়। এরকমই হয়। আজও হলো। মাথা নামিয়ে সাপ দুটো সুড়সুড় করে চলে যেতে থাকে। নরম ঘাসমাটির ওপর দিয়ে। যেতে যেতে বাগানের দুটো সান ফ্লাওয়ার গাছে শরীরটাকে বেশ করে প্যাঁচায়। তারপর নেই কোন নড়নচড়ন। দুটো সাপেরই একই ভূমিকা। বাস্তুসাপ হবার সপ্ন দেখছে নাকি রে। হেই হেইয়ো। আমার হাতের দুটো ঢিল এসে সান ফ্লাওয়ার গাছের গায়ে লাগে। সাপ দুটো এবার মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যেই সাপ দুটো ফণা তুলে দাঁড়ায় অনেক অনেক উঁচুতে। তারপর সাপ দুটো হঠাৎ ফণা নামিয়ে একসঙ্গে দুটো বৃত্ত রচনা করতে থাকে। দুটো সাপই মুখ দিয়ে নিজের লেজটাকে কামড়ে ধরেছে। দুটো স্টীলের চাকা যেন তৈরি হয়ে যায়। শক্ত, খুবই শক্ত। তারপরই হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে। চোখের নিমেষে সাপ দুটো লাফ মেরে একেবারে কৃষ্ণচূড়া গাছের আগায়। অদ্ভুত ব্যাপার! হঠাৎ আবার সাপ দুটো শূন্যে ঝাঁপ দেয়। বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে সাপ দুটো আবার নিচে নেমে আসে। আবার দুটো স্টীলের চাকা তৈরি হয়। তারপর লাফ মেরে অন্য আরেকটা গাছের মাথায় উঠে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ভাসতে ভাসতে নিচে। আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু গাছগুলি পালটে যায়। এ যেন এক খেলা। আমি অবাক হয়ে দেখতে থাকি। তারপর আমি ছুটতে থাকি। এই অদ্ভূত ব্যাপারটি সবাইকে জানানো দরকার।

দুই

ছুটতে ছুটতে আমি একসময় একজন মাঝারি বয়স্ক লোককে হন্তদন্ত হয়ে সামনে হাঁটতে দেখি। আমি লোকটিকে ডাকতে থাকি, একটু শুনবেন? লোকটি শুনতেই পান না। আমি আবার ডাকি, শুনছেন, শুনছেন? আশ্চর্য লোকটি আমাকে একবার পেছন ফিরে দেখে আরো জোরে হেঁটে মিলিয়ে যান। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে পড়ি। দেখি, সামনেই একজন বৃদ্ধ লোক লাঠি নিয়ে হাঁটছেন। আমি এগিয়ে বৃদ্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বলি, জানেন, দুটো সাপ---।

চোখ দুটি গোল করে দাঁড়িয়ে পড়েন বৃদ্ধ লোকটি, সা-প!

--- হ্যাঁ সাপ। উড়ন্ত সাপ।

--- উড়ন্ত সাপ?

--- হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার পায়ের কাছ থেকে দুটো সাপ সু-ই-ই করে এক গাছের মাথায় উঠে গেল। বাতাসে ভাসতে ভাসতে আবার নেমে এল।

--- বেশ বেশ।

--- তারপর আবার উঠে গেল, আবার নেমে এল। আপনি দেখবেন সাপ দুটোকে? দেখবেন?

--- উহু, আমার একদম সময় নেই। এক কাজ করুন আপনি, এবার যদি সাপ দুটোকে হাতের কাছে পান, খপ করে সাপ দুটো ধরে ফেলবেন। তারপর বেঁচে দেবেন। ভালো দাম পাবেন। আচ্ছা চলি। বলে বৃদ্ধ লোকটি চলে যেতে থাকেন।

দুঃখ হয় আমার, ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না বলে। এমন সময় ফিটফাট পোশাক পরা এক যুবককে দেখি এদিকেই আসছে। হাতে বেশ কয়েকটি কভার ফাইল। কাছে আসতেই আমি বলি, এক্সকিউজ মি, আপনার কি খুব তাড়া?

যুবকটি দাঁড়ায়, কেন বলুন তো?

আমি বলি, দুটো সাপ দেখবেন? উড়ন্ত সাপ। বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়ায়।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে যুবকটি বলে, দুঃখিত স্যার, আমার একদম সময় নেই। চলে যায় যুবকটি। এবার আমি একা একা হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে আমি এক বাসস্ট্যাণ্ডে একজন ভদ্রমহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। চোখে সানগ্লাস। শ্যামলা এবং বেশ সুন্দরী। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার কিনার দিয়ে অসুস্থ মানুষেরা চলে যায়। আমি ভদ্রমহিলার দিকে তাকাচ্ছি। ভদ্রমহিলাও আমার দেকে তাকাচ্ছেন।

তিন

সামনে এগিয়ে আমি মৃদু হাসি। ভদ্রমহিলাও মৃদু হাসেন। আমি বলতে শুরু করি, জানেন, আজ আমার পায়ের কাছ থেকে দুটো সাপ লাফ মেরে গাছের উপরে উঠে গেল, তারপর ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে এল। শুনে ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, বাঃ, বেশ ইন্টারেস্টিং তো। আমি আবার বলতে থাকি, আপনি সাপ দুটোকে দেখবেন? ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত তো, কেউ বিশ্বাস করতে চাইছেনা। যাবেন আপনি আমার সঙ্গে? উড়ন্ত সাপ দুটোকে দেখবেন? যাবেন?

--- কী বলছেন, আপনার সঙ্গে যাবো?

--- হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে দেখাতে চাই।

--- ঠিক আছে। যাবো। তবে দুহাজার টাকা দিতে হবে সেজন্য।

--- দুহাজার টাকা! কেনো?

--- আমার টাকার দরকার।

--- কেনো?

--- কেনোর জবাব দীর্ঘ, এ মুহূর্তে দেবার ইচ্ছেও নেই। বলুন দুহাজার দিতে পারেন কিনা। তাহলে যাবো।

--- কিন্তু আমার পকেটে এক হাজার টাকার মত আছে যে।

--- শুধু হাজার। ঠিক আছে, চলুন। আমাকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু। কি, রাজি?

যে অদ্ভূত ব্যাপারটার আমি একমাত্র সাক্ষী, সেটাকে দেখার জন্যে অন্য কেউ রাজি না থাকায়, আমার রাজি না হয়ে কোনো উপায় নেই তাই 'রাজি' বলেই আমি ভদ্রমহিলাকে নিয়ে অকূলস্থলের দিকে ছুটতে থাকি। হাতে সময় মাত্র ত্রিশ মিনিট। জানিনা, সাপ দুটো এখন আগের জায়গায় আছে কিনা।

সূচিপত্র

ছোটগল্প

সব কিছু কবিতা নয়

তনিমা হাজরা

সেদিন ভোরে দরজা খুলে বেরোবার পর নীলিমা প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল রানি মাসিমার সঙ্গে। তাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন তিনি। ঠোঁটের পাশটা কেটে গিয়ে একটু ফুলে রয়েছে। থুতনিতেও বেশ কালশিটে। হাঁটার গতি একটু খুঁড়িয়ে ব্যথাতুর।

"আহা রে মেয়ে। শ্বশুর ভাসুরের সামনে যাবার আগে মুখখানা একটু আড়াল রাখিস...কি হাল করেছে বাছার.....এভাবে কেউ.... একটুও মায়া নেই গা...সারাটা রাত একটুও ঘুমোতে দেয়নি বুঝি?"

চোখ দুটি পাথর মেয়েটির। গতকাল তার ফুলশয্যার রাত ছিল। তার সেই অনেকদিনের স্বপ্ন সাজানো রাত। কত কিছুই তো ভেবে রেখেছিল সে বন্ধুদের কাছে নানা গল্পকথা শুনে।

তার বান্ধবী মিতা বলেছিল, সে আর তার বর নাকি সারারাত গান, কবিতা আর অনেক গল্প করেছিল। সাথে কিছু উষ্ণতাও ছিল বৈকি তবে তা নাকি ভারি মধুর। এছাড়া অনুপমা, শ্রীপর্ণা, সুমেধা, আত্রেয়ী সবার কাছে শুনে শুনে মনে হয়েছিল এই রাতটা বুঝি ভারি সুন্দর আর স্বপ্নমুখর। তবে তার বেলাতেই কেন? কেন এসব উল্টোপাল্টা?

কালকের ওই রাতের কথা ভাবলে এখনো গা কেঁপে উঠছে তার। ভাবছে কীভাবে সে আজ রাতে আবার মুখোমুখি হবে ওই ছেলেটির। কীভাবে খেলবে শরীরের খেলা? কীভাবে করবে সংসার তার সাথে? কীভাবে ভালবাসবে তাকে সারাজীবন? কীভাবে? সে কি বলে দেবে সব কথা বাইরের সবাইকে? সেটা প্রকাশ করে দেওয়া কি সাহসিকতা? নাকি ঢেকে রাখাই গৌরবের? এই বৈবাহিক ধর্ষণ কি আদৌ শাস্তিযোগ্য?

কই আজ সারাদিন তার মুখে, গলায় এত কালশিটে দেখেও কেউ তো প্রতিবাদ করলো না তার হয়ে?

যা হয় হোক অষ্টমঙ্গলায় বাড়ি গিয়ে মা কে সব বলে দেবে সে। আর ফিরবে না এখানে। এই ক'টা দিন না হয় দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়ে দেবে ....

.......আজ আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরছে নীলিমা। মা কে বলেছিল সব কথা। দেখিয়েছিল গা খুলে তার ভালোবাসার যত ক্ষত।

মা বলল, ওসব একটু আধটু হয়। সব সয়ে যাবে আস্তে আস্তে। একবার বিয়ে হলে অনেক কিছুই মানিয়ে নিতে হয় মা।

ট্রেন দাঁড়ালো কি যেন একটা জংশন ষ্টেশানে।

"তুমি কিছু খাবে?" তার সামনে সেই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিপুরুষ। এখন কতো সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর আর মায়াময়। কে বলবে যে এই ছেলেটিই রাতের বেলা কি ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে।

"একটু জল খাব শুধু"। বলে নীলিমা।

সত্যি সয়ে যাবে বোধ হয় একদিন সবকিছু। তাতে কি আছে, আস্তে আস্তে না হয় সইয়ে নেবে সবকিছু। কতো কিছুই তো মেনে নিতে শিখতে হয় মেয়েদের। কী ছেলেমানুষিই না সে করতে যাচ্ছিল সবার সামনে এসব বলে দেবার প্ল্যান করে? ছি: ছি: কী ভাবতো সবাই তার স্বামীকে। তার সবকিছু ঢেকে রাখাই তো তার কর্তব্য। এমনি করেই একদিন ঠিক মমত্ববোধ তৈরি হয়ে যাবে দুজনার মধ্যে একসাথে কাটাতে কাটাতে।

ধুর!!! প্রেম বলে আবার কিছু আছে নাকি? সেও ভারি অবুঝ আর ছেলেমানুষ। হয়তো ওসব একেবারেই অলীক কল্পনা। সবাই রঙ চড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে তাকে। কিংবা ভারি দুর্লভ আর দুষ্প্রাপ্য কিছু। ওসব সবার ভাগ্যে কি আর জোটে ?

কীভাবে যেন সময়টা পেরিয়ে তারা গন্তব্যে পৌঁছে যায়। বাঙ্ক থেকে সুটকেশটা নামিয়ে ছেলেটি বলে, "এসে গেছি।"
নীলিমা নীরবে ছেলেটির পিছুপিছু এগিয়ে চলে।

সূচিপত্র

ঈশানকোণ

কবিতা

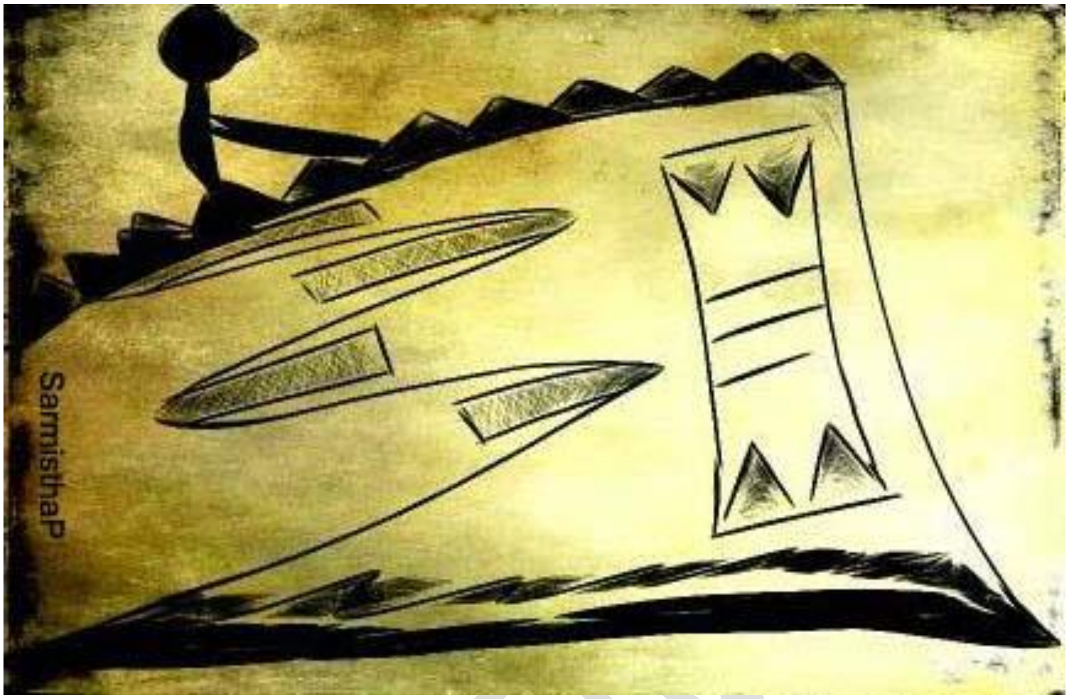

সুবীর ঘোষের কবিতা

না-বলা প্রতিধ্বনি

দূরতম বৃক্ষের আড়াল থেকে
কার হাতছানি এসে বদলে দেয়
জীবনের মানে।
জীবন নদীর মতো যারা বলে
তাদের গোপনে ডেকে
কত কী বলার থাকে;
সব কথা নীরবেই না-বলা
প্রতিধ্বনি হয়ে
পাহাড়ের খাঁজে আর

সর্পিল বালিয়াড়ি ধরে
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
পথ ভেঙ্গে রাস্তা করে নেয়।

কথামালা না ফুরোতে

দূরের রাস্তায় শুধু চোখের পাহারা,
চোখের কাজলে লুকোনো অশ্রুর বাষ্পগন্ধ রাত;
রাত কি কখনো গোনে তারাদের শ্রেণিভাগরেখা?
অমূল্য আসর যায় অকারণে ভেসে।
যত কথা পরিকল্পিত আসরে বলা যায়
তার অর্ধেক রাস্তার বর্ষায় ডুবে যায়;
মিছিলনগরী আনে গভীরতাহীন এক প্রগাঢ় অসুখ।
কথামালা না ফুরোতে সবাইকে ডেকে আনা
দুঃস্বপ্নের ইশারা হয়ে ইঙ্গিতরমণীর
কৃত্রিম আঁচল ঘিরে ঘুরতেই থাকে।

সূচিপত্র

ছোটগল্প

একবার এসেছিলো নীরবে

নীহার চক্রবর্তী

ভাদুরিবাড়ির ছোট ছেলে রাজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো খুব। ও বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে কেউ ভাবতে পারেনি। উচ্চশিক্ষিত বাড়ি। অর্থের কোন মা-বাপ নেই সেখানে। দেখে তো মনে হয় সবাই খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। তাহলে? কারণ কী? কারণ খোঁজা চলতে থাকলো।

দুদিনের মধ্যেই কারণ জানা গেলো। রাজন প্রেমে পড়েছিলো বাড়ির কাজের মেয়ে বিশাখার। ওকে ঘরে তুলতে চেয়েছিল বৌ হিসাবে। সে বিধবা যুবতী। মায়ের মৃত্যুর পর সে ভাদুরিবাড়িতে কাজে যোগ দেয় বছর পাঁচেক আগে। বিশাখার গোপন চোখের জল বুঝি উপলব্ধি করতে পেরেছিল রাজন।

তাই বিশাখাকে গোপনে কথা দিয়েছিলো ওর বৌ করবে বলে। সহবাসও হয় রীতিমতো গুপ্ত অভিসারে।

কিন্তু বিশাখার আর তর সইল না।

একদিন রাজনের কণ্ঠালগ্ন হয়ে বলল, "অনেক দেরী হয়ে গেছে গো। এবার আমাকে বৌ হিসাবে স্বীকার করে নাও। আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই।"
শুনে খুব ভ্রূ কোঁচকাল রাজন।

তারপর ওকে দূরে ঠেলে দিয়ে বেশ মেজাজের সঙ্গে বলে উঠলো, "আমি কি বলিনি তোমাকে? এত তাড়া কীসের? আমাকে সবদিক দেখতে হবে না? আর একথা বলবে না তুমি একদম।"
শুনে খুব অবাক হল বিশাখা।

অস্ফুটে বলল শুধু রাজনকে, "তোমার তো এখন একটাই দিক। আমি। তাই না?''
তারপর বিশাখার দু'চোখ জুড়ে জল এলো। কালক্ষেপ না করে প্রমাদ গুনতে গুনতে গুপ্ত অবস্থান থেকে বেরিয়ে গেলো। আনমনে হাঁটতে শুরু করলো যেদিকে চোখ যায় ।

সরাসরি বিশাখা গেলো স্থানীয় থানায়। কেঁদে-কেঁদে সব জানালো থানার বড়বাবুকে। সে শুনে থ। তার মনে হল তখন, এ কেমন রুচি ভাদুরিবাড়ির ছেলের? ভাবা যায় না। কিন্তু তার চাউনির মধ্যে বিশাখা খুঁজে পেলো না কোন দিশা।

সে বুঝেও বলে বসলো কান্না-ভেজায় গলায় তাকে, "আমি কাজের মেয়ে বলে আমি মানুষ না, আমার মধ্যে প্রেম নেই, এমন কথা কখনো ভাববেন না। মানুষের আবার ভেদাভেদ কীসের? অর্থ আর শিক্ষা দিয়ে বুঝি...''
বিশাখার কথাগুলো বেশ বুকে লাগলো বড়বাবুর তখন।

সে লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি সব দেখছি, মা। তুমি চিন্তা কর না। আমি নিজে গিয়ে তোমাকে বৌ করে ওই বাড়িতে তুলে আসবো। দম্ভ ওদের চুরচুর হবে। হতেই হবে।"

তারপর মনে আশার আলো নিয়ে বিশাখা নিজের ঘরে ফিরে এলো। ঘর বলতে ওর চার বছরের একটা ছেলে আর বৃদ্ধ বাবা। বিশাখা কাউকে কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। ওর মধ্যে অস্থিরতাও কম দেখা গেলো না। নিজের কপালের জন্য খুব চোখের জল ঝরাল গোপনে। ভাদুরিবাড়িতে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিলো ও। শুধু দেখা ছাড়া ওর তখন উপায় ছিল না।

তারপরেই একদিন বিকালের দিকে রাজন গলায় দড়ি দিলো দোতলার ঘরে সিলিং-ফ্যানে। পরে জানা গেলো, স্বয়ং বড়বাবু এসে ওকে সহ বাড়ির সবাইকে খুব ভয় দেখায়। শিগগির বিশাখাকে রাজনের বৌ করে ঘরে তূলতে বলে। সবাই হতবাক। রাজনের মা কেঁদে আকুল। বাবা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সাথে-সাথে। রাজনের দুই দাদা আর দুই বৌদি লজ্জায় মুখ ঢাকে।

কথাও দিয়ে বসে বড়বাবুকে রাজনের বড়দা রঞ্জন, "আমরা দেখছি। সব ব্যবস্থা করছি।"

বড়বাবু এক সপ্তাহের সময় দিয়ে তারপর চলে যায়।

চারদিকে যখন ছি-ছিক্কার পড়ে গেলো, তখন একদিন সকালের দিকে বিশাখা আবার রাজনদের পাড়ায় এলো। ওকে দেখে অনেকেই ছুটে এলো। ঘিরে ধরতে চাইলো ওকে। কিন্তু বিশাখা না দাঁড়িয়ে ভাদুরিবাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে কান্না শুরু করলো হাউহাউ করে।

কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলো, "এ কেমন সমাজ আমাদের? সাহসী হতে গিয়েও সাহস হারায় তার জন্য। এ কেমন প্রেম? কেন এ সমাজ মানে না উঁচু-নিচুর প্রেম? বলতে পারেন কেউ? আমি কি রাজনবাবুকে মেরেছি? সমাজ মেরেছে। সমাজের মানুষ মেরেছে ওকে। আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা আমাকে।"

বিশাখাকে দেখে ছুটে এলো রাজনের বড়দা রঞ্জন।

সে ওর দু'হাত চেপে ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল, "চুপ কর, বোন। খুব সত্যি কথা বলেছিস তুই। রাজন বাড়িতে বললে বুঝি আমরা মানতাম না। রাজন মরেছে নিজের ব্যর্থতায়। তোর প্রতি ঘৃণায় নয়। পুলিশের ভয়েও নয়। আমরা এবার তোর ঘরের ব্যবস্থা করছি আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকেই। আর কাঁদিস না। তোর চোখের জলের ফোঁটাগুলো এক-একটা লজ্জা আমাদের জন্য।"

বিশাখার মুখে তখন ম্লান হাসি ফুটল। চোখের জল মুছে নিলো কাপড়ের আঁচলে।

তারপর রাজনের মা, দাদা-বৌদির উদ্দেশ্যে বলল কষ্টের এক চিলতে হেসে, "এবার ঘর করলে আমি দুশ্চরিত্রা হব। বিশ্বাস করুন আমাকে। আমি এ বাড়ির মেয়ে হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। শুধু রাজনবাবুর স্মৃতি থাক আমার বুক-জুড়ে।"

সেইথেকে বিশাখা আবার কাজ করছে ভাদুরিবাড়িতে। এখন ও একদম বাড়ির মেয়ের মতো। কিন্তু এদিকে রাজনের জন্য চোখের জল একে-একে প্রায় সবার শুকিয়ে গেলেও বিশাখার চোখের জল শুকায়নি। কাজের একটু অবসরে বিশাখা চোখের জল ফেলতে শুরু করে। চোখের জলের বাঁধ মানে

না ওর। তখন বাড়ির যেই ওকে দেখে, সে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে। বিশাখা তখন খুব কষ্টে সারামুখে হাসি এনে চোখের জল শুকিয়ে দেয় নিমেষে।

সূচিপত্র

বনানী ভট্টাচার্যের কবিতা

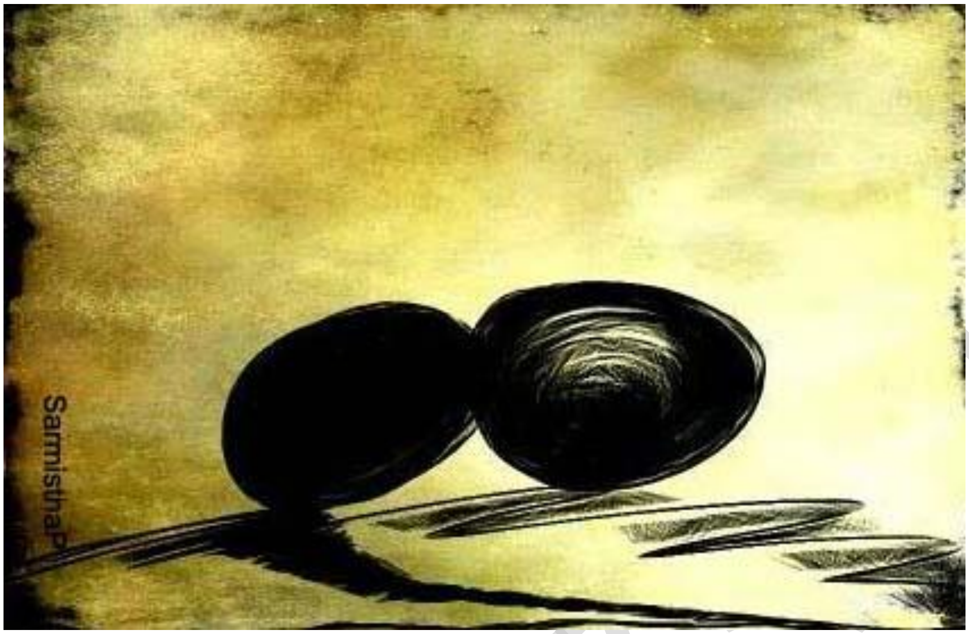

উৎস

এ তো বড়ো অসহায় কোনো অচেনা দহনবেলা
পুড়ছে, পুড়ছে প্রতিদিন তিলে তিলে বিশ্বাস!
গোপন টানে ছিন্ন কাহিনী, যেন ভাঙার খেলা
সুতোয় বাঁধা পুতুলের কানে বাতাসের ফিসফাস।

পুড়ছে উৎস, পুড়ছে সবই, ভালোলাগা, ভালো থাকা
ধমনীতে বিঁধে নীল বিষ সব রক্তের সাথে মেশে
যে চোখ দেখেছে শিউলি সকালে নীলাকাশে বলাকা
পদপিষ্ট ঘাসের অশ্রুও সে পান করে নিঃশেষে!

দশটি আঙুলে কত কেরামতি, মুক্ত হওয়া কী সোজা!
উচ্চ তাপে, চরম চাপেই শরীরী কাঠামো গড়া

কেউ কী দেখেছে শূন্য হাতে কেবলই শূন্য খোঁজা!
কারো কারো কাছে কপটাচরণই থেকে গেছে অধরা।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল
পেছনের কামরাগুলি ফাঁকা ফাঁকা
কিছু চেনামুখও দেখলাম যেন, তাই না?
"এত রাতে কোথায় যাচ্ছো তোমরা,
ফিরবে কখন?" মন বলে ওঠে....
পাশে দাঁড়ানো কোনো কাছের মানুষ
একপা বাড়িয়েছিল,
"তুমিও!" হাত টেনে ধরি হঠাৎই
"যেও না" কাতর কণ্ঠে
"আমি যে একা থাকতে ভয় পাই
আমি যে তোমাদের সাথে থাকতে চাই
যেও না"....
ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল....

সূচিপত্র

কবিতা

হর্ষতরঙ্গ

মাসুদ খান

সরো সরো, সরে দাঁড়াও, ঈশান থেকে তিরের বেগে ওই নেমে পড়ছে হংসবাহিনী– উঠানে, অঙ্গনে, ধানখেতে, নয়ানজুলিতে। আর নৈর্ঋত থেকে ছুটে আসছে দস্যি বাচ্চারা। এসেই দুই ডানা পাকড়ে ধরে উঠে পড়ছে রাজহাঁসের পিঠে। তা-ই দেখে ঘাস থেকে মুখ তুলে মুচকি হাসছে খরগোশ, প্রশাখাজালের আড়াল থেকে কাঠবিড়ালি।

এক হোঁদলকুতকুতে, দুষ্টের চূড়ামণি, এমনিতেই লেট লতিফ, তদুপরি পিছিয়ে পড়ছে বারবার, কুকুরছানার কান মলে দিয়ে, পোষা শজারুর শলাকা ধরে টান মেরে, খুচরা নৌটাংকি সেরে, দুই কাঁধে দুই অস্থির গুঞ্জরণরত বাচ্চা বসন্তবাউরিকে বসিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসছে শেষ হংসবাহনের দিকে। হাঁসটি তখনো নয়ানজুলির জলীয় রানওয়েতে। উড়ালে উন্মুখ। বাচ্চাটি জলকাদা মাড়িয়ে

এসে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে উঠে পড়ছে সর্বশেষ হংস-ফ্লাইটে। পেছন পেছন হেলেদুলে আসছে কান-মলা-খাওয়া নাদুসনুদুস কুকুরছানাটিও।

তুলাপ্রসূ সব শিমুলের গাছ, ফলপ্রসূ সব আম ও আমড়া বাগান। তাদের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে হংসবাহিনী। এক-একটি হাঁসের পিঠে এক-একটি শিশু। উড়ে যেতে যেতে উৎফুল্ল বাচ্চারা ভূমণ্ডলের দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দেবার মুদ্রায় ফুঁ দিচ্ছে হাতের তালুতে। একবার ডান হাত, আরেকবার বাম। দুই দিকে জেগে উঠছে ছোট-ছোট হাওয়াহিল্লোল। আর সেই হিল্লোলের হালকা ধাক্কাতেই সঙ্গে-সঙ্গে আগুন ধরে যাচ্ছে হুলুস্থুল কৃষ্ণ- ও রাধাচূড়ায়, আর আমের পাতারা খিলখিল আহ্লাদে ঢলে পড়ছে প্রতিবেশী আমড়ার পাতাপল্লবের ওপর।

আজ আগুনে-বাতাসে গুলতানি, পলাশে-শিমুলে শয়তানি, আমে-আমড়ায় দুষ্টামি...

আর সাগর দুলছে পাহাড় ঢুলছে আকাশ ঝুলছে মাথার ওপর উড়াল শহর

ভোলাভালারা ভুলছে, লহরী তুলছে, ধীরে উর্ণা খুলছে মেঘের বহর...

সূচিপত্র

সূচিপত্র

কবিতা

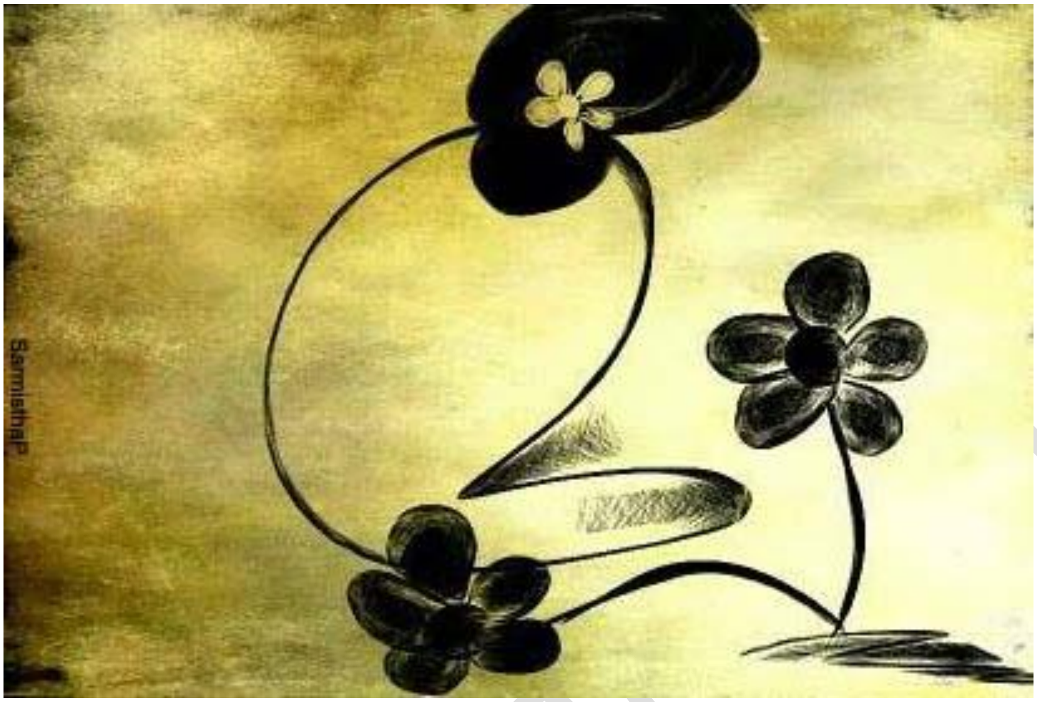

দেওয়ালের গল্প
তুষ্টি ভট্টাচার্য

৯)

এই দেওয়ালেরই নাভি থেকে উঠে এসেছিল হ্রীং
ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ -
কুলকুণ্ডলিনীর জেগে ওঠার সম্ভাবনায়
ডেকে উঠেছিল ভাষা আর
স্বরের প্রতিফলন বেজেছিল এই দেওয়ালেই।
দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরে এই ভাষাই
হারিয়েছিল তার স্বর মরীচিকার দেহে।
নাভিপদ্মের গোখরো ভ্রমণ শুনিয়েছিল
আরও এক নতুন ভাষাতেই।

সূচিপত্র

কবিতা

সাম্বা অথবা স্লাট শেমিং
অরুণিমা চৌধুরী

কেউ কেউ শব্দ বোনে
নুনের আলপনা এঁকে বিষাদ বাড়ায়
কারো কারো শব্দের আড়াল কঠিন সামুদ্রিক ঝড়

জল তলদেশ থেকে উঠে আসে জাহাজভর্তি আধপচা ভিসেরা
কেউ কেউ নির্মম নুন পরিবেশক, নুনের জাহাজে ভর্তি জারানো মমির ভিড়... মমিদের কটা মুখ!

হাওয়া মোরগের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা
না থাকায় সমুদ্রঝড়ের মুখে ও

জলে নুনের ঘনীভবনে রহস্য ঘনীভূত হয়,
রক্তে নুনের মাত্রা বেড়ে গেলে মধ্যযামে ভুল পথে চালিত হই

আমি নপুংসক, অর্ধনগ্ন, অবন্তিকা! পেট আর বুকে পালক ও পয়সা সাজিয়ে সাম্বা নাচি

ভেসে যাওয়া কাঠের পাটাতন তখনও
স্ট্রিপটিজ খেলে   শরীরের বিপদজনক বাঁকে
অভিজ্ঞ নাবিক হাতের চলন
বোঝার চেষ্টা করে দোল খাই, দোল খাই আর
খুলে ফেলি অপুষ্ট নুনজলের দাগ

ভয়াবহ দারুখন্ডে সাজানো নগ্নদেহী নুনের উপাচার, দণ্ডের চারপাশে হিসহিস করে নির্বিষ সাপের ঠোঁট.. কামড়ায় কিন্তু মারেনা

নাবিক লবণ সংরক্ষক   শব্দের আড়ালে নুন বুনে ছায়ায় দাঁড়ায়, চাপা ক্ষতে ঘাম জমে
ঘনীভূত হয় শ্লেষ   কান্নাজলে নুনের ঘনত্ব বাড়ে আচমকা ভেসে উঠি

আসলে হাওয়া মোরগের অবস্থান পালটে গেলে যেকোন যাত্রাপথ দুর্গম হয়ে ওঠে

শব্দের আড়ালে বোধ, অথবা বোধের আড়ালে
করুণ রসে জারিত হয়
ভেসে যাওয়া কাঠের উপাখ্যান... ভাসমান প্রমোদভবন

সবটাই কমলে কামিনী, আসলে এসমস্ত কিছুই
দেখেন নি

লম্পট শব্দে শুধু পুরুষের অধিকার
অবন্তিকা!

সূচিপত্র

কবিতা

অস্পষ্ট পৃথিবী
তমা বর্মণ

আলো নেই অন্ধকার নেই।
কিছু ছায়ানুভব মথিত হৃদয়ে মৃত সবুজ ঘাসে নদীর পাথুরে কিনারায় এলিয়ে যত্নহীন আশ্রয়ে, একটি সঠিক আশ্রয় খুঁজতেই পৃথিবীর বয়স পেরোয়, সাদা কাশবন রং নখে জমছে বুকে সাদা শীত।

খুব শীতে উষ্ণ চাদরের গভীর যেমন খুঁজে পরস্পরের সান্নিধ্য পৃথিবীর ইচ্ছেও
তেমনি কুয়াশা ----- কুয়াশার রেণুর ভেতর অবিরল খুঁজছে রক্ত-মাংস প্রাণ,
জীবনের গভীর আস্বাদ...... প্রিয় অক্ষর শব্দ ভাষা মিলে মিশে অফুরান বাক্য।

বেঁচে থাকি কত কত বাক্যের ভেতর --- ধড়হীন হৃদয়হীন কাঠামোহীন বিকলাঙ্গ ভিড়,
মিছিল যেমন পতাকা বুকে সবচেয়ে নিরাপদ দায়বদ্ধহীন।

যারা সব দায় নেবে বলে এসেছিলো সেই সব যুবকের দল কবেই নির্বাসিত ---
তাদের প্রয়োজন সীমিত, অস্পষ্ট নামগুলো মৃত্যুর গণ্ডীতে রেখে তাই আমাদের
এই সব দিন-রাত্রির রূপান্তর। কোথায় হলো বা রূপান্তর ?
একই দুঃখ, ক্রমশ লীন শান্তি-সুখ, একই পাপ, মিথ্যার ক্ষয়ে অর্ধ-সত্যে অবগাহন।

অস্পষ্ট পৃথিবীর ভেতর নেই এতটুকু পরিবর্তন !

মন্বন্তরের পর আরেক মন্বন্তর, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অশান্ত হাওয়ার ভেতর উদ্বেলিত
রাত্রির দহন, দিনের ক্ষুব্ধ তাপের ভেতর নিদারুণ সব একই গল্প দেশের পথে হৃদয়ের পথে,
আদিবাসী যুবক বেলাশেষে ঘরে ফিরে গেলেও পৃথিবী চিরকাল উদ্বাস্তু।

থিতু হতে গেলেই নাড়িয়ে যায় উঁচুউঁচু হাতগুলো ধুলোমাখা বসতভিটে
নতমুখ ছাপোষা মানুষের স্বভাবের ভেতর। হ্যাঙ্গারে টাঙানো স্বপ্ন প্রতিদিন ধূসর চোখে নিয়ে
ওরা ঘুমায় প্রিয় নারীর কল্পিত বুকে, আকাঙ্ক্ষার মৃত আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৃতবৎ নক্ষত্ররা
আজীবন তবু আলো খোঁজে জেনেও যে -- মৃতরা আলো দেখে না।

তবে কি ঘুমের ভেতরও জীবন থাকে !

রাস্তায় যারা ভনভন মাছির ভেতর একটু আগে ঘুমালো --- আদি জীবন ছিল তাদেরও,
কর্পোরেশনের তালিকায় অস্পষ্ট হতে হতে একদিন আমরাও যাবো আলোহীনতায় !
কোনো এক শ্রেষ্ঠ অন্ধকারে পাবো কি ঠাঁই কোনোদিন ?

ঘাই মেরে উঠে যাবো তারপর তারায় তারায় স্পষ্ট চেতনায় !

মানুষের আবেগ অনুভব পরস্পরতা নেই আর।
বিজ্ঞাপিত শহর এখন এক গভীর নার্ভের অসুখ।

ফুটপাথ ঘুমায় ক্লান্তিতে ----- বিনিময় সামান্য,
আমরা জানি, সকলেরই ভালো থাকা জীবন ------ রোমশ হাতে বিনিময়

জন্ম, মৃত্যু, গর্ভনিরোধক আর অবৈধ সঙ্গম সুখ।

অবৈধ বলে আজ যা সেও পৃথিবীর কোনো এক বিপর্যয়ের উত্তুঙ্গ হাওয়া থেকেই উঠে এসেছে।

কালের কিনারায় বৈধ-অবৈধ সবই অস্তিত্বহীন, কিংবা বিশাল অস্তিত্ব জুড়ে জীবনের সবকিছুই অর্থবহ অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয় !
আলো নেই... অন্ধকার নেই... ভেদ করা কোনো আগুনের স্ফুলিঙ্গ নেই... প্রিয় কোনো স্পষ্ট স্বপ্ন নেই ---
প্রিয় মৃত্যুও নেই এখানে।

ধূসর পৃথিবীতে ঘাসফুল মরে গেছে হলুদ পাতার ভেতর কবেই ...

সূচিপত্র

অভিষেক ঘোষের কবিতা

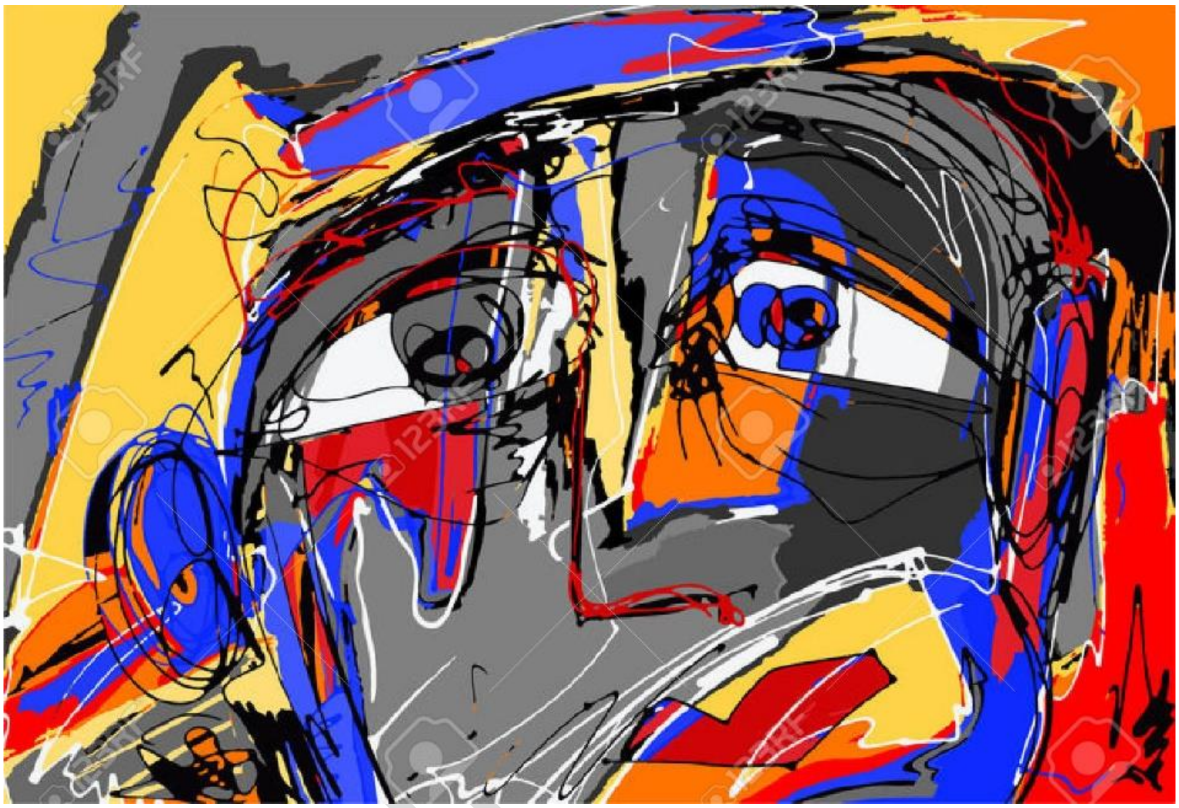

হাত গুটানো ঈশ্বর রাজ্য

বিন্যস্ত ঈশ্বর, ঘর বাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে রাখা,
অগ্নিকন্যার জিভে, আমার মরে, জেগে
থাকা,
হে হাহাকার রজনী, তোমাকে জানে
সবাই,
আমিও কি জানি...
সে পুরোটাই, যে বৃদ্ধির জল মহিষ, বিকেলে

খায় দুধ...
খাবি খেতে খেতে জলভ্যাস শিখেছে,
মানুষ নয়...সান্ধ্য পানা পুকুরে...
ছোট ছোট বুদ বুদ।

গেটের বাইরে বেঞ্চি

কোন কিছুর ভিতর যারা বসে থাকে, আর পাহারাদার এসে
তাড়িয়ে দেয়, পশ্চিমের ধুলোয় স্তুপ হওয়া হাওয়া, আর বাড়ি।
মনে সংঘর্ষ হতে থাকে, রাতের লাঠি ঠক ঠক করে এগিয়ে
যায় সকালের দিকে...তারা পাহারাদার...আমরা সারাজীবন
বসে থাকতে পারি,
ঝর্ণার কিচমিচ আওয়াজে, অরণ্যের দোষ কেটে যাওয়া বৃষ্টিতে
রক্ত মাটি থেকে উঠছে না জেনেও, শহর কাঠুরের কুড়ুলের
ধারে,
আর গাছ কাটে নি কেউ, যারা মানুষ কাটতে পারে
যেন আমিই কেটেছি নদীর চর, ঝিম ঝিম জোনাকির আলোয়,
ধপ করে জ্বলে যত বর্ণ প্রবেশ করে রামধনু আলো ও ঝিলমিল
অন্ধকারে
একটা সুতো দিয়ে ট্রেন গাড়ি চলে যায়...যাত্রীরা নড়ে ওঠে,
তবু আমি জানি, কেউ পড়ে যায় না...কেউ মরে যায় না,
তারা অল্প অল্প করে সীমা পেরিয়েও সহ্য করতে পারে।

ঘাসজোনাকির বন্ধু

আবার মনে হচ্ছে এই ফোন নম্বরটা বদলাতে হবে...খুব কষ্ট করে এখন আর লিখি না, যা মনে হয় কুয়াশায় আবৃত নৌকার সারি সারি চলে যাওয়া নদীর উপর উঠে বসে থাকা ঘাসজোনাকির মত আমায় নিভিয়ে দেওয়ার থেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রাখতে বেশি পছন্দ করে,

আর আমিও চাই সভ্যতা অসভ্যতা সবকিছুই এ বি সি ডির মত ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে বসে থাকি,

যাতে আমার মাথার ভিতরে এসে কেউ না টেলিফোন করে বিরক্তি করে, আর বলে ভাই মশলা দে না একটু, ভাই কুড়ি তিরিশটাকা ধার দিবি?

সবাই এখন বুঝে গেছে, আমার থেকে দু তিনশো টাকা চাইলে, পাওয়া যাবে না...

ভাবছি এবার যখন আবার নম্বরটি বদলাবো, আর কোন ঝাউপাতার কন্যা, শিয়াল কুকুরের বন্ধু, বিস্রিত দালালদের থেকে, নম্বরটি সামলে রাখব...যদি পারি আমার শতাধিক চিন্তা, মনের আতঙ্ক, আর ভুলে যাওয়ার ভয়কে আমার নম্বর দিও না...আমি কিন্তু এবার থেকে আবার গায়েব হয়ে যাচ্ছি...পারলে এটুকুই সামলে রেখো, আমায় তো আর পারলে না তেমন...

সূচিপত্র

কবিতা

প্রদীপ্ত - অরুন্ধতী এবং বাকিটুকু কাল্পনিক

পিয়ালী বসু

আমি প্রদীপ্ত

আজকাল প্রতি রাতেই বৃষ্টি নামে
আকাশের মধ্যে জন্ম নেয় অন্য এক আকাশ, যার রঙ স্লেট কালো

সহস্রাধিক স্বপ্ন থেকে উঠে আসে এরকম এক একটি রাত
ঘনিয়ে ওঠা জলের স্পর্শবিন্দুতে সাজিয়ে রাখি তোমার নাম অরুন্ধতী

জোয়ার আসে ... শরীরের গোপন আলপথে ভিড় করে গহন স্পর্শযন্ত্রণা
গর্ভফুল ছেঁকে তোলা সন্ধেয়
তোমার কথা আরও বেশী করে মনে পড়ে অরু

এসো ... ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমায়
মৃত্যুর এ মৃগয়া ভূমিতে আলোর স্কেচ এঁকে দাও ... নিয়ে যাও আমায়

সকলে আমায় অরুন্ধতী নামে জানে

আমার কোন আত্মীয় নেই
তুলনার বিশ্বাসের জোর বরাবরই মারাত্মক
এই সহজ কথাটা বুঝে নিয়েছিলাম মাত্র দশ বছর বয়েসেই

তখন আস্তে আস্তে পেখম মেলছে শরীর
দীঘায় অকাল বোধনের আলোয় যেদিন সিঁদুর পরালে
সেদিন চিবুকের নির্জনতা সাক্ষী রেখে আমি সতীত্ব হারিয়েছিলাম

তারপর বছর ঘুরেছে ...
প্রতিরাতে তোমাতেই লীন হয়েছি, তোমাতেই শেষ

তোমার ছিপছিপে শরীর রোমশ বুক আর চওড়া কাঁধে
জীবনের ত্রিকোণ উড়ান প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছিলাম ...

কিন্তু বুঝিনি ...
বিধ্বস্ত হতে কোন নির্ধারিত দিনক্ষণ লাগে না ... সেদিনও লাগে নি

বাঘবন্দী খেলায় অকালবোধনকে স্বাগত জানিয়েছিল সময়

তোমার আর আমার জীবনের চতুষ্কোণিক মহল্লায়
সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল সব ... সমাপ্তির আগেই

এতক্ষণ যে একক কথোপকথনটির সাক্ষী ছিলেন আপনারা, সেই প্রদীপ্ত এবং অরুন্ধতী ... দুজনেই ছিল আমার কলেজের বন্ধু (অবশ্য ছিল বলছি কেন, এখনও আছে ...)

জীবনের ধারাবিবরণীতে হয়তো দৈনন্দিন ক্রম রাত্রির হদিশ পাওয়া যায়না সেভাবে, কিন্তু ভুলের একপেশে ছায়াগুলি দীর্ঘতর হয় বেলা বাড়ার সাথে সাথে ...

সঠিক বিবৃতির জন্য যে অন্তরঙ্গ ছায়ার প্রয়োজন, সেটা প্রদীপ্ত বা অরুন্ধতী ... কেউই দিতে পারে নি একে অপরকে, তাই নিরীহ খতিয়ান বিন্দুগুলি পরবর্তী পদক্ষেপ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, ভ্রমচক্র সহযোগে

আজকাল নিজেকে সান্ত্বনা দিই এইভেবে যে, বিচ্ছেদের পাশাপাশি আর একটি বিন্যাস হয়তো সম্ভবপর হতো, যদি ... ভাবার উত্তরাধিকারকে লাগাম দেওয়া যেতো

সূচিপত্র

প্রণব বসুরায়ের কবিতা

চোরকে ধর্

ঘুমের মধ্যে কথার মাঝে
যাই, জড়াই,
দিনযামিনী খোলাই থাকে
ধান-মড়াই...

কোথাও কিছু নেই তো ভুল
রাত প্রহর?

তবুও যদি দেখিস ভুল

সব ছলনা।
আমার ঘুড়ি অন্যে ওড়ায়
অলস বোনা...

মাঠের শেষে টিলা দ্যাখায়
দুয়ার ঘর---
যক্ষপুরীর নদীর পাশে
শুকনো চর

রোজই শুনি পুলিশ আসে
চোরকে ধর্

আজ থাক কাচের আশ্রম

প্রত্যাঘাত ও প্রতিরোধ ভুলে
মেলে দিই আজ নিঃশর্ত অঞ্জলি...
আর ভাবি না আমি কোথা আছে
জানু, স্তন অথবা অবাক তল্লাট--
জেনেছি এখন এরা পোড়ে বাজির মতোন--
দর্শকের বেপথু উল্লাস আর
পোড়া বারুদ মাত করে
বিষ ঢালে, বাতাসে ছড়ায়...

হুল্লোড় হয়েছে অনেক
সাজঘরে কত যে পোষাক পাল্টে পাল্টে গেছে
চুলের কাঁটা ও ক্লিপ, চুরুটের পাইপ ও টাই
জায়গা বদল করে গিয়েছে হারিয়ে

এখনও পারি আগুনে ঝাঁপের খেলা
তুমিও মৎসকুমারী হতে, তাও
আজ থাক কাচের আশ্রম
চলো বসি দর্শকের সীটে

সূচিপত্র

স্বপ্নবৃত্তান্ত

বৈদূর্য্য সরকার

১

ওদের নিয়মিত দেখা হত। সকালে ভিড় বাসে অফিস যাওয়ার সময় কিংবা বাড়ি ফেরার সময়। মুখচেনা হয়ে গেলে যা হয়— বুঝতে পারার মতো মৃদু হাসি কিংবা তাকানো। পাশে বসলেও সোহম কথা বলার চেষ্টা করেনি কখনও। দু'জনের কানেই থাকতো হেডফোন। 'কেউই আজকাল কানে সাধারণ কথাবার্তা ঢোকাতে চায় না বলেই ...এত সমস্যা' ভাবতে ভাবতে সোহম লক্ষ্য করত

ওর এফ.এমের ফ্রিকোয়েন্সি ৯২.৭ আর সোহম দাঁড়িয়ে থাকতো ৯৪.৩-এ রেট্রো গানগুলো শোনার জন্য। শুনতে শুনতে বেশ ঢুল আসে ওর।

সোহমকে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে ঘুমোতে হয়। সোহম স্বপ্নের পথ ধরেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে এতদিন। কাউকে ও নিজে থেকে কিছু বলেনি কখনও। কিন্তু ক্রিটিক্যাল সিচ্যুয়েশনে ওকে নিজের মনে বিড়বিড় করতে দেখতো বন্ধুরা। সোহম ছোট থেকেই দেখেছে – পরীক্ষার আগের দিন রাতে ঘুমের মধ্যে যা দেখতো যার অনেকটাই মিলে যেত। টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেও পূর্বাভাস পেয়ে যেত স্বপ্নে।

এখনও সোহম যে কেন সবসময় একটা দ্বিধায় ভোগে, কুন্তল ভেবে পায় না। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে, কিন্তু সোহম যে সবার সাথে নিজেকে মেলাতে পারে না — এই অসহায়তাটা ও বোঝে। স্বপ্নের ভয় যার মধ্যে একবার ঢুকে যায় তার কি বা করার থাকে ! সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে – 'কোথা থেকে কি হয়ে যায়'... !

কুন্তলই একমাত্র বন্ধুদের মধ্যে টিকে আছে – সেটা সম্ভবত একপাড়ায় থাকার জন্যই। বারো বছর ' রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ'র পর, বঙ্গবাসী কলেজ। কুন্তল সেলসের চাকরিতে ঢুকে গেছিল আর সোহম মাস্টার্স করে পাড়ি দিয়েছিল ভিনরাজ্যে। এখন দু'জন একসাথে উল্টোডাঙায় নামে, তারপর কুন্তল ওঠে সেক্টর ফাইভের বাসে আর সোহম ধরে বাইপাসের। রোজ ওরা ফেরার সময় একসাথে ট্রেন ধরে। বেশ কিছুদিন টাইম ঠিক করা আছে— ৭:৩২ । রোজের এই অভ্যেস।

'মেয়েটা বাইপাসের আশপাশেই কোথাও চাকরি করে, উল্টোডাঙার পরে নামে' – বলেছিল সোহম। তারপর বলেছিল 'এটুকু জানা নিয়ে কারুর সাথে কি কথা বলা যায়'... ভেতরের একটা ছটফটানি চেপে রাখার সুযোগে কুন্তল অবশ্য ওকে কথা শোনাতে ছাড়ে না-- 'সেই কোনকালের কলেজের বান্ধবীর মমি আঁকড়ে পড়ে আছিস...আর সে বাচ্চা মানুষ করছে কোথাও'। সারাদিনের পর এর'ম কথা শুনলে যে কোনও লোকেরই মাথা গরম হয়ে যেত। কিন্তু সোহম অবাক ভঙ্গিতে কুন্তলের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর সত্যিই মনে ছিল না— প্রিয়ার কথা কুন্তলের মতো কেউ কেউ মনে রেখেছে।

সেদিন উল্টোডাঙার সামনে লোক খালি করে যাওয়া একটা বাসে মেয়েটার মুখ যেন উড়ে চলে যেতে দেখল বলে যেন মনে হল সোহমের। কিছু বোঝার আগেই অবশ্য বাসটা বেরিয়ে গেল, ও ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকল। গরমের এই সন্ধেয় এক ঝলক হাওয়া খেলে গেল। বাড়ি ফেরার সময়ের ভিড়টাকে আর কষ্টকর মনে হল না। ভাগ্যিস তখন কুন্তল সিগারেট টানছিল অন্যদিকে মুখ করে। ট্রেন ধরার দ্রুততায় দৌড়নো লোকজনের কনুইয়ের ধাক্কা পাঁজরে লাগতে নিজের মুখ দিয়ে

বেরনো ‘আহ’ শব্দে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সোহমও কুন্তলের সাথে চলতে শুরু করে দিল তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে।

২

সাতটা থেকেই রোদ্দুর সেখানে। একটা ঝকঝকে অ্যাপার্টমেন্টে জায়গা হয়েছিল সোহমের। সব মিলিয়ে প্রায় চারশো ফ্ল্যাট ছিল ‘অক্ষয়া’তে। গোটা দশেক বিল্ডিং – এ বি সি ...। ও থাকতো এইচ ব্লকে। সামনে ছোট একটা বাচ্চাদের পার্ক, পেছনে লন। পুরোটাই আঁকা ছবির মতো সাজানো। ফ্ল্যাটগুলো বেশ বড়সড় - গেস্টরুম, সারভেন্ট কোয়ার্টার পর্যন্ত অ্যাটাচড। ন’টা দশটার পর থেকে গোটা চত্বরটা শুনশান হয়ে যেত। শীতের ছুটিতে ফ্যান চালিয়ে ঘরে বসে ক্লান্ত হতো সোহম।

মানুষ সেখানে থামতো না। একটু দূরে হাইরোড। প্রায় সমান্তরালে চল গেছে রেললাইন। হাইরোডের ধারে একটা লাল পতাকা সামুদ্রিক হাওয়ায় উড়তে দেখতো সোহম। রোজ রাত্তিরে ওখানে দাঁড়িয়ে দ্রুতগামী যানবাহন দেখে ও নিজেকে বেশ বিষণ্ণ বলে আবিষ্কার করতো, তারপর ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফিরে আসতো। সমুদ্র ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। তার গন্ধ না পাওয়া গেলেও রাস্তার ধারে সামুদ্রিক মাছ ভেজে বিক্রি হতে দেখতো সোহম।

প্রথম সপ্তাহে অসুবিধা হলেও ক’দিনের মধ্যে সব চেনাজানা হয়ে গেছিল। লোকেরা কেউ কারোর ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতো না বলেই বাঁচোয়া, নয়তো সোহমের এই অদ্ভুত কাজকর্মে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠতো। প্রথমে নিজেও বুঝতে পারতো না ওর কাজটা আসলে ঠিক কি। সামান্য কিছু ডক্যুমেন্ট আদানপ্রদান করার জন্য ওর মতো একটা নভিস ছেলেকে এখানে এই বিরাট ফ্ল্যাট দিয়ে কোম্পানি রেখেছেই বা কেন!

ইন্টারভিউয়ের দিনটা বেশ স্মরণীয় ছিল ওর কাছে। বিভিন্ন কথাবার্তা বলেছিল ওরা। আগের রাতের স্বপ্নের মতোই কিভাবে আন্দাজে কিছু ফোরকাস্ট মিলিয়ে দিয়েছিল সোহম। চাকরিটাও ও পেয়েছিল বেশ অদ্ভুতভাবেই। অফার লেটার পাওয়ার সময় ওকে বলা হয়েছিল –‘ইনস্ট্রাকশানের বাইরে কিছু করার চেষ্টা করবেন না, বোঝার চেষ্টাও নয়... দেন ইউ উইল বি ইন ট্রাবেল’। শুনে চমকানোর ব্যাপার হলেও এত সহজে চাকরি পাওয়ার উত্তেজনায় সেসব খেয়াল করেনি সোহম।

এখানে এসে ও মিঃ রেড্ডির আন্ডারে। তিনি এই অফিসের চিফ ফিনান্স অফিসার। ওনাকে হেল্প করাটা ওর কাজ হলেও বেশিরভাগ সময়ে কিছু করতে হতো না। নিয়মিত করতে হত যেটা-- মার্কেট বন্ধ হওয়ার পর রিপোর্ট পাঠাতে হত মিঃ পান্ডের কাছে। প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও আসতে আসতে ও বুঝতে পারছিল পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি সংক্রান্ত কিছু ডেটা থাকতো অথবা কোনও

নির্দেশ। জয়েন করার প্রথমেই নির্দেশ এসেছিল—‘অফিসের বাকীদের থেকে আলাদা থাকতে হবে’। পুরো ব্যাপারটাই যেন একটা ধোঁয়াশা। অন্যরাও কোনও কারণে ওকে এড়িয়ে চলত।

একা একা থাকার সময় স্বপ্নের প্রবনতা আরও বেড়েছিল। এই সময়েই কিছু টাকা পয়সা হাতে আসার ফলে এলোমেলো এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করতো সোহম। স্বপ্নের পথনির্দেশে একা এর’ম ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল প্রিয়ার সাথে। দু’জনকেই নিয়তি টেনে নিয়ে এসেছিল বোধহয়। আগের বছর ও বিয়ে হয়ে এখানে এসেছে। ওর বর এখানকার বেশ পরিচিত মুখ। মাঝারিমাপের বিজনেসম্যান সেই ভদ্রলোকের সাথে পরে আলাপও হয়েছিল। ওর অফিসের খবরে তিনি বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে ওর বস মিঃ রেড্ডির প্রসঙ্গে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে উনি বুঝেছিলেন, সোহম কিছুই না বোঝা একটা লোক। আর কথা না এগোলেও প্রিয়া এগিয়েছিল অনেকটাই ... ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল, সোহমেরও তখন ফেরার পথ নেই। সবকিছু যেন ভেসে যেতে লাগলো।

তবে এর মধ্যে কাজের কাজ যেটা হয়েছিল মিঃ রেড্ডির সাথে থাকতে থাকতে ও বেশ কিছুটা বুঝতে শুরু করেছিল পুরো বিজনেস প্রসেসটা। তারপর থেকেই শুরু হল সমস্যা। সোহম বুঝেছিল, জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হলে মানুষের জীবনে যা নেমে আসে তা হল-- সমস্যা। দু’চারবার মিঃ রেড্ডিকেও অবাক করে দিয়েছিল সোহম। ওনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, ফর্মুলা বা মডেলের থেকেও সোহমের ইনটিউশানের অ্যাকুরেসি বেশি হয় কি করে !

সোহম ক্রমশ বুঝতে পারছিল- রেড্ডি বা পান্ডের মতো লোকেরা সুপরিকল্পিত বেশ কিছুদিন ধরে একটা এমন প্ল্যান করছে যাতে শেয়ার মার্কেট হঠাৎ কোলাপ্স করবে। সেই বিপুল অর্থের বিলিব্যবস্থাও হয়ে আছে। এতে মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে ফরেনের বিজনেস হাউসগুলোও জড়িত। সে যদিও এই ষড়যন্ত্রের সামান্য বোরে। তবু একটা অপরাধবোধ কাজ করতে থাকতো। কিন্তু এখানকার কোনও প্রভাবশালী লোককে ও চিনতো না। অনেকবার প্রিয়ার মাধ্যমে ওর বরকে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি। যদিও প্রিয়া ততদিনে ওর দাম্পত্য থেকে প্রায় বেরিয়ে আসার পথে।

‘সব বলবো...’ বলার আগেই সেই ভয়ঙ্কর দিনটা চলে এল। প্রিয়ার সাথে আগের রাতের সুখে ও মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠেছিল নানারকম অস্পস্ট ছবিতে। ভেতর থেকে কে যেন বলছিল- ‘পালাতে হবে’। সোহমের অ্যাপার্টমেন্টে তার আগের দিন প্রিয়া হঠাৎ এসেছিল বলে ও অফিসে যেতেও পারেনি। সেদিন সকালে কিছুক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন উল্টোপাল্টা খবর উড়তে লাগলো দেশ জুড়ে। সেদিন মিঃ রেড্ডিকে ফোনে না পেয়ে-- ‘আপাতত যোগাযোগের উপায় নেই’ বুঝেছিল সোহম। অফিসে গিয়ে দেখলো একটা নোটিশ লটকে অফিস বন্ধ। সোহম দেরি করেনি তারপর – নিজের যা ছিল সেসব নিয়ে কোনোক্রমে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল।

৩

সবাই জানতো, মাঝের দু'টো বছর ব্যাঙ্কিং ফিনান্সের কাজকর্ম শিখে সোহম কলকাতায় ফিরেছিল শেয়ার-বন্ড-মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে রীতিমতো স্পেশালিষ্ট হয়ে। যদিও ন্যাভ ভ্যালু কিংবা স্টকের গতিপ্রকৃতি সামাজিক জীবনে একেবারে না বোঝা একটা ব্যাপার —অন্তত ওদের মফস্বল এলাকার । তাই সোহম 'কি যেন একটা করে... ভাল কিছুই হবে'-- হয়ে রয়ে গেছে চেনাজানা লোকজনেরা যদিও ওর স্বপ্নে মাঝে মাঝে ফিরে আসে ফেলে আসা জীবনের কথা, কখনও আফসোস হয় কিন্তু কারোর কাছে প্রকাশ করতো না কিছু। সেই দুবছরের ছবি ও যেন মুছে ফেলতে চাইতো জীবন থেকে।

ছোট থেকে একসাথে পড়াশোনা ওঠাবসা খেলাধুলো করে কুন্তল ঠিকঠাক গুছিয়ে ফেলেছে সব। এখন ওর মেয়ের বয়স দু'বছর। অথচ ওর থেকে বেশি মাইনে পেয়েও সোহম যে কেন সংসার জীবনে এর'ম ঘেঁটে গেল তা পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে সবার কাছে জবাবদিহি করতে করতে কুন্তলের প্রান ওষ্ঠাগত। পুজোয় সোহমের দিদির বাড়ি যাওয়ার সময় মা একরকম শেষ কথা বলে গেছেন – ' বৈশাখের মধ্যেই কিছু করতে হবে'... নয়তো তিনি আর থেকে ওখান থেকে ফিরবেনই না। সেই থেকে বাল্যবন্ধুর মাতৃআজ্ঞার দায় মেটাতে নানা উপায় নেড়েচেড়ে দেখছে কুন্তলরা। অধিকাংশ লোক শুনে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তবু কুন্তল গোঁ ধরে আছে। যা হবার হোক, এবার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতেই হবে! সোহমের চোখেও একটা চাপা উত্তেজনা দেখে কুন্তল ভাবতো --এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ শুধু শেয়ার ইক্যুয়িটির হিসেবনিকেশ নিয়ে বাঁচতে পারে নাকি!

যদিও সোহম মুখে বলেছিল – 'বাসে এর'ম খুচরো ব্যাপার কতই হয়, সেসব আমল দেওয়া এই মধ্য ত্রিশে সম্ভব নয়' ... শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল কুন্তল -- 'ন্যাকা চৈতন'। কুন্তল ভাবতো- সোহম বরাবরই একটু আলাভোলা প্রকৃতির, টাকাপয়সার জটিল হিসেব নিকেশের বাইরে ওর বিশেষ কিছু বোঝা হয়ে উঠল না জীবনে। কুন্তল এটাও জানতো না - বেনামী ফেসবুক আইডি থেকে সোহম ওর সাথে নিয়মিত কথা বলে। একটু বয়স হয়ে যাওয়া মেয়েটাও ওকে দায়িত্ব নিতে বলেছে ঘুরিয়েফিরিয়ে বহুবার। স্বপ্নে ঠাই পাওয়া ওই মেয়েটাকে সোহম ধাওয়া করে যে তার পাড়া পর্যন্ত পৌঁছে অনেক খবর সংগ্রহ করেছে – সে ধারণা কুন্তলের ছিল না।

৪

বেশ কয়েকদিনের মতো সে রাতের স্বপ্নেও মেয়েটা ফিরে এল কিন্তু মুখটায় যেন মিশে যাচ্ছিল কান্নাভেজা প্রিয়ার মুখ। এবার স্বপ্ন ওকে বলেনি কি করবে – তবু সোহম প্রথমবারের জন্য নিজে

সিদ্ধান্ত নিয়ে পরেরদিন মেয়েটার মুখোমুখি হতে চেয়েছিল। প্রিয়ার স্বামী ক'বছর আগের সেই শেয়ারের ধ্বসের পর থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। মেয়েটার বাবাকে তখন সুইসাইড করতে হয়েছিল। সোহম মনে করতো- প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওকে। প্রিয়ার কথা না ভেবেই ও শুধু ভয়ের কারণে সেদিন পালিয়েছিল। তাই আজ ওর সামান্য শক্তিতে সোহম চাইছে মেয়েটাকে নিশ্চয়তা দিতে। কুন্তল এই সিদ্ধান্তে বেশ অবাক ও খুশি হয়ে সেদিন হাফ সি.এল নিয়ে মেয়েটার বাড়ি গেল সোহমের সাথে।

সূচিপত্র

অনুবাদ গল্প

পিণ্ডদান

এল বীরমঙ্গল সিংহ

(মণিপুরি থেকে বাংলায় অনুবাদঃ লেখক)

হামারি সাথ ঘুমনে আয়া হ্যায় - একথা বলে রেলে আসার পথে পরিচয় হওয়া বিহারের সেই দুই যুবক আমাদের দুই ভাইকে সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে পাণ্ডাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করে গয়া রেল স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। দেখিয়ে সাবজি, হমে পাতা হ্যায় ইনলোগোকে সাথ

ট্রেন পে জান পহেচান হুয়া হ্যায়। গয়া বহুৎ খতরনাক জায়গা হায়। মৎ যাইয়েগা ইনলোগোকে সাথ। এ কথা বলে পাণ্ডারা ব্যাগ ধরে টান দিল এবং আমাদের পিছু নিল।

আমাদের পুরোহিত মোহন ঠাকুর গয়ার মাহাত্ম্য শুনিয়েছিলেন - এটি হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। গয়াতে পিণ্ডদান করতে পারলে সব জীবই মুক্তিলাভ করে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। তাই বলছিলাম দেবদ্বিজগৎপ্রাণ তোদের মৃত পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আগেই তোরা দুই ভাই গয়াতে গিয়ে পিণ্ডদান করে এসো।

আমরাও পুরোহিতের আজ্ঞা মেনে এক কানি জমি পনেরো হাজার টাকায় বন্ধক রেখে মৃত পিতার আত্মার সদ্‌গতির জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করতে এসেছি। দু বছর আগে ছোটবোন থম্বালের বিয়ের সময় দুই কানি উর্বর ধানি জমি চল্লিশ হাজার টাকায় কৃষ্ণধন মহাজনের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল তা আজও ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে তমালদা আমাদের নিষেধ করেছিল - জমি বন্ধক রেখে মৃত পিতার আত্মার সদ্‌গতির চেয়ে আগে নিজেদের বাঁচার চেষ্টাটা করো। তোদের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এলে পরে তীর্থে গিয়ে খুব করে পিণ্ডদান করো। গয়া খুব খতরনাক জায়গা। রেল থেকে নামতেই পাণ্ডারা চেপে ধরবে। প্রতিবেশীদের কথা না শুনে খুড়ো নীলমণি পেনশনে পাওয়া সব টাকা পয়সা নিয়ে একাই গিয়েছিল গয়াতে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। তার আর কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

বহু তীর্থভ্রমণে অভিজ্ঞ শামুখুড়ো আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন - খবরদার, ভারত সেবাশ্রম সংঘ ছাড়া অন্য কোথাও উঠবি না। তাই আমরা স্টেশনের পাণ্ডাদের খপ্পর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে স্টেশনের বাইরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাউন্টারে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি।

বিহারের ছেলে দুটোর সাহায্য নিয়ে অতি কষ্টে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম। বাইরে আসতেই চোখে পড়ল ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাউন্টারটি। সেখানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মাইকে ঘোষণা করছে। আমাদের নাম ঠিকানা লিখে সংঘের একটি কার্ড ধরিয়ে দিল। সংঘের আশ্রমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের একটি অটোতে তুলে দিল। আশ্রম খুব একটা দূরে নয়। সেখানে পৌঁছতেই আমাদের বিশ্রামের জন্য একটি ঘরের চাবি হাতে তুলে দিল। আশ্রমের মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন - আজই কি পিণ্ডদান সম্পন্ন করবেন?

হ্যাঁ, সম্ভব হলে আজই কাজ শেষ করে ফিরে যাব। আমরা চানের জন্য তৈরি হচ্ছি। মাথা নেড়া করতে হবে কিনা মহারাজকে জিজ্ঞেস করার জন্য বড়দা বললেন। মাথা নেড়া করতে হলে চান করে লাভ নেই। একটা মণিপুরি গামছা পরে আরেকটা গায়ে জড়িয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম - মহারাজ! পিণ্ডদানে কি মস্তক মুণ্ডন করতে হয়?

- কোত্থেকে এসেছেন, ত্রিপুরা থেকে বুঝি?

- হ্যাঁ, ত্রিপুরা থেকে।

- ত্রিপুরা থেকে আসা তীর্থযাত্রীরাই এই প্রশ্ন করে থাকে। গয়াতে সাধারণত মাথা মুণ্ডন করা হয় না। প্রয়াগে তা হয়ে থাকে। মুণ্ডন করতে গিয়ে রক্তপাত হলে পিণ্ডদান করা যায় না।

মহারাজের এ কথা শুনে আমি ফিরে আসার জন্য পেছসন ফিরতেই তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করলেন - আপনি কি মণিপুরি?

গলায় পৈতে, তুলসীমালা তার ওপর মণিপুরি গামছা পরে মহারাজের সামনে যখন হাজির হয়েছি, আর তো নিজের পরিচয় গোপন রাখার উপায় নেই। আমি ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলাম।

- আপনাদের পিণ্ডদান কাজটি কিন্তু আমরা করতে পারব না, ঝামেলা হবে।

কী বলছেন উনি! গয়াতেও কি সামাজিক দলাদলি হয় নাকি? শামুখুড়োর কথামতো আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘে শরণাগত হয়েছি। তাদের শরণাগত হয়েও মুখের উপর বলে দিলেন আমাদের পিণ্ডদানের কাজ করতে পারবেন না!

- মণিপুরি জাতির জন্য মণিপুরের রাজারা ভারতের প্রায় সব প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পুরোহিত নিয়োগ করে গেছেন। তাই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাদের পিণ্ডদানের কাজ আমরা করতে পারব না।

এতো দেখছি দলাদলির ব্যাপার নয়। আমাদের সব উদ্বেগ মুহূর্তে উবে গেল।

- আপনাদের পুরোহিত নির্দিষ্ট করা আছে। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনারাই তাদের সঙ্গে দর কষাকষি করে ঠিক করে নেবেন। তবে ঠিকমতো দর কষতে না পারলে কিন্তু আপনাদের ভালো টাকা গচ্চা দিতে হবে।

মণিপুরিদের জন্য গয়াতেও নির্দিষ্ট পুরোহিত রয়েছে শুনে খুশি হলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে খুশির আবেশ উবে গিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম, পুরোহিতের সঙ্গে দর কষাকষি করতে হবে ভেবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ব্যাবস্থাপনায় কী সুন্দর ভাবে সব কিছু হচ্ছে। যার যার সাধ্য মতো আশ্রমের অফিসে টাকা জমা দিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে গেল। তাদের পুরোহিতরা খুব কম পয়সায় পিণ্ডদানের কাজ করে দেবেন। আমাদের জন্য অফিস থেকে বের হয়ে মহারাজ গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন - মণিপুরি পাণ্ডা হ্যায় ক্যা?

- হ্যাঁ জি, বলে পালোয়ানের মতো লম্বা চাওড়া দুজন লোক এগিয়ে এলো। তাদের এই চেহারা দেখে আমার তেমন ভক্তিভাব জাগল না। কেবল মনে হল এই দুই পালোয়ানের সঙ্গে কি আমি যুঝতে পারব!

তারা দুজনে আমাকে আশ্রমের বাইরে নিয়ে গেল। প্রথম পরিচয়েই জিজ্ঞেস করল - কিৎনে মে কাম করাওগে?

আমি উল্টো তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম - আপনারা কত টাকার মধ্যে কাজটা সমাধা করে দেবেন?

- জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে, খরচ তো একটু বেশি হবে বই-কি।

আধ ঘন্টা ধরে গরু-ছাগল কেনার মতো দর কষাকষি হল। আমরা দুই ভাই এসেছি শুনে মাথাপিছু দু'হাজার এক টাকা করে চার হাজার দু'টাকা দাবি করল।

তাদের কথা শুনে রাগ চেপে রাখতে পারলাম না - হম দু'ভাই অলগ অলগ বাপকা বেটা নেহি হু, একহি বাপকা বেটা হ্যায়। তো অলগ অলগ দক্ষিণা কিউ?

আমার রাগ দেখে দুই পালোয়ান ঠাকুর একটু নরম হল - ঠিক আছে একটু কম দিলেও হবে।

- সত্যি কথা বলতে কি পয়সা আছে বলে আমরা গয়াতে পিণ্ডদান করতে আসিনি। বাপ আমল থেকে চলে আসছে বলেই পিণ্ডদান করাতে এসেছি। যত পারা যায় কম টাকাতে আমাদের কাজটা করে দেবেন।

- কত টাকা দেবেন?

- চারশো এক টাকার মধ্যে কাজটা করে দেবেন।

- তিন হাজার, দু হাজার, এক হাজার দর কমতে থাকে। আমি চারশো এক থেকে এক পয়সাও বাড়াতে রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত এই টাকাতেই রফা হল। কালবিলম্ব না করে চারশো এক টাকা আমার কাছ থেকে আগাম নিয়ে নিল। তারপর তারা একটা টাঙ্গা ডেকে এনে বললেন - এতে উঠে পড়ো, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে দিও।

বলিহারি! আধ ঘন্টা ধরে দর কষাকষির পর আগাম দক্ষিণা রেখে আমাদের পিণ্ডদান করার জন্য একা একাই যেতে বলছে!

– হবে না, পুরোত ঠাকুর আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে। না হলে অন্য কাওকে আমাদের সঙ্গে পাঠান। শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একজন লোক পাঠালেন। লোকটা ফলগু নদীর তীরে নিয়ে আমাদেরকে আর এক পাণ্ডার হাতে তুলে দিল। দেখলাম নদীর তীরে অনেক লোক সারিবদ্ধভাবে

বসে একসঙ্গে পিণ্ডদান করছে। মনে হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের ব্যবস্থাপনায় পিণ্ডদানের কাজ চলছে। আমরা দুই ভাইকেও ফল্গু নদীর তীরে এক গাছের নীচে নিয়ে গেল সেই পান্ডা। সেখানে এক পুরনো মন্দির রয়েছে। নদীর তীরের পান্ডা ঠাকুর মণিপুরি ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন - ফুল, ফল, চাল, তিল ইত্যাদি এনেছ? এসো, বসো। তার এসব কথা শুনে ভালো লাগল। এই তো গয়ার আসল মণিপুরি পুরোহিত। বসতে বলে তিনি সেই পুরনো মন্দির থেকে পিণ্ডদানের দরকারি সব উপাচার নিয়ে এলেন। পুরোত মশাই হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ভাষায় পিণ্ডদানের মন্ত্রপাঠ করব - মণিপুরি, বাংলা না কি সংস্কৃত ভাষায়?

- দেবতারা মণিপুরি ভাষা জানে না, সংস্কৃতেই মন্ত্রপাঠ করুন। আমি বললাম।

সে মুহূর্তে কোত্থেকে এক নাপিত এসে হাজির হল। চুল দাড়ি কামাব কিনা জিজ্ঞেস করল। চুল দাড়ি কামাতে গিয়ে রক্তপাত হলে পিণ্ডদান করা যাবে না এই ভয়ে রাজি হলাম না। নিয়ম রক্ষা করে গালের উপর নাপিতকে ক্ষুর আলতো করে টানতে বললাম। গয়ার নাপিত বলে কথা। নিয়ম রক্ষার ক্ষুর চালালেও বিশ বিশ চল্লিশ টাকা দাবি করল। শেষ পর্যন্ত দশ টাকায় রফা হল।

- আমি গয়ায় পিতৃকর্ম সম্পাদন করতে এসেছি। কখনও ক্রুদ্ধ হব না, ব্রাহ্মণ দক্ষিণা দিতে কার্পণ্য করব না। পুরোত মশাই হিন্দিতে আগাম শপথ নেওয়ালেন। মন্ত্র ভেবে বড়দা আর আমি হাতে ফুল নিয়ে চোখ বন্ধ করে শপথ বাক্যগুলো মন্ত্র পড়ার মতো করে পড়তে লাগলাম। পিণ্ড তৈরি করে সংস্কৃত না অন্য কী ভাষা বোঝা গেল না বিড় বিড় করে করে মন্ত্র পড়তে পড়তে পুরোত মশাই পিণ্ডদানের কাজ চালিয়ে গেলেন। আমরাও তার নির্দেশ মতো ফুল, চাল, তিল, জল পিণ্ডের উপর দিচ্ছিলাম। মন্ত্র পড়তে পড়তে পুরোতমশাই হঠাৎই বলে উঠলেন - ব্রাহ্মণ ভোজনকে লিয়ে কিৎনা দেঙ্গে সংকল্প করো।

- এতে সংকল্প করার কী আছে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাধ্য মতো কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই তো হল। আমি বললাম।

- না না, সংকল্প করতেই হবে। তোমরা দুভাইয়ে পাঁচশো পাঁচশো করে এক হাজার টাকা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য দিতে হবে।

- ওগুলো সব আমরা আগাম দিয়ে এসেছি।

- ক্যা বাত হ্যায়, ব্রাহ্মণকা পেট বিকাকে আয়া?

- তা আপনারা জানেন। আমরা কিন্তু দিয়ে এসেছি।

- ব্রাহ্মণ ভোজনের সংকল্প না করলে আমি কিন্তু তোমাদের পিণ্ডদানের কাজ করতে পারব না।

ওহো! নদীর পাড়ের পুরোত মশাইও দেখছি নকল পুরোহিত। এসো, বসো, ফুল, তিল ছাড়া একটি মণিপুরি শব্দও তিনি জানেন না। তার অন্যায় আবদারে আমার মেজাজ চড়তে লাগল। বেশ গলা চড়িয়ে বললাম, পুরোত ঠাকুর আপনি যদি কাজ করতে রাজি না হন তবে কী আর করা, পিণ্ডগুলো নিজেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেব। ঈশ্বর স্বাক্ষী আছেন।

বড়দা আমাকে সংযত করলেন - কাজটা আগে সমাধা করি। মণিপুরি ভাষায় আমাদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে পুরোত মশাই কিছুই বুঝতে পারলেন না।

পুরোত মশাই, আপনি যেহেতু জুলুম করে আমাদের কাছ থেকে দক্ষিণা আদায় করতে চাইছেন, আপনাকে আমাদের কিছুই দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তবু কিছু দিতে হয় তাই এগারো এগারো করে বাইশ টাকা দক্ষিণা দিচ্ছি।

- ঠিক আছে, দুশো এক করে চারশো দু টাকা দিয়ে দাও।

- আপনি আমাদের পিণ্ডদান ক্রিয়া সমাধান করবেন কি করবেন না তা স্পষ্ট করে বলুন। না হলে আমরা উঠে পড়ি, ঈশ্বর উপর থেকে সব দেখছেন।

কী জানি ভাবল, পুরোত মশাই আবার মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন। অতি কষ্টে পিণ্ডদানের কাজটা সমাধা করা গেল।

পুরোত মশাই এরপর আমাদের চরণপাদ, অক্ষয়বট প্রণাম করিয়ে বিষ্ণু মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের সামনে আমাদের হাঁটু গেড়ে বসিয়ে হাতে ফুল ধরিয়ে আবার সংপল্প করতে বললেন। এবার আমি হাতে ফুল নিলাম না। কী সংকল্প করতে হবে তা আগাম জানাতে বললাম। পুরোত মশাই অনেক নরম হয়েছেন।

- আমি ত্রিপুরাতে বেড়াতে আসব, তখন আমাকে চারটি নতুন ধুতি দেবে বলে সংকল্প করো।

পুরত মশাইয়ের এই কথায় তার প্রতি আমার করুণা হল।

- আমি সংকল্প করছি, ঠাকুরমশাই আপনি একজন সঙ্গী নিয়ে ত্রিপুরায় বেড়াতে আসুন। রেলে দুজনের আসা যাওয়ার সব খরচ আমি বহন করব। তার উপর ত্রিপুরায় আপনার থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা আমি করব। এবার পুরোত মশাই খুব খুশি হলেন। প্রাণ খুলে মনের সব কথা বলতে শুরু করলেন। তার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগল।

- পুরোত ঠাকুর, আপনি কেন তখন আমাদের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায় করতে চেয়েছিলেন? আপনার সেই জুলুমবাজির জন্যই টাকা দিতে গিয়েও দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি।

পুরোতমশাই দুঃখ করে বললেন - কী আর বলব, এখন গয়াতে মণিপুরি তীর্থযাত্রীরা আগের মতো আর আসে না। ফলে আমাদের বাঁচা বড় কষ্ট হয়ে পড়েছে। দেখতেই পাচ্ছ ভারত সেবাশ্রম সংঘের পুরোহিতরা একসঙ্গে একশো তীর্থযাত্রীকে বসিয়ে পিণ্ডদান করাচ্ছে। জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা করে হলেও কত টাকা দক্ষিণা পাচ্ছে! আর আমাদের মাত্র দু একজন। তাও সবদিন জোটে না। নিরুপায় হয়েই আমরা যত পারা যায় দক্ষিণা আদায় করার ফন্দি পাকাই। কিছু মনে করো না। আমাদের তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। তোমরাও দল বেঁধে একসাথে এসো। তাহলে দু'পক্ষেরই লাভ হবে। থাকা খাওয়ার কোন কষ্ট হবে না, আমরাই সব ব্যবস্থা করব।

ঠিক সে মুহূর্তে গয়ার এই পুরোত ঠাকুরকে আমাদের গ্রামের সংবেদনশীল পুরোহিত মোহন ঠাকুরের মতোই দেখাচ্ছিল।

সূচিপত্র

মুক্তগদ্য

সেল্ফি

স্বর্ভানু সান্যাল

স্ব-বাবু মহারাজ যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘মহারাজ এই যে দিনরাত অনবরত সকলের মুখে একটাই শব্দ শুনতে পাচ্ছি.. সেল্ফি.. ইহা কি রূপ! এটি খায় না অঙ্গে মর্দন করে’’?

মহারাজ যযাতি বললেন, উত্তম প্রশ্ন বৎস.. খুবই রুচিকর আর আকর্ষণীয় এই বস্তু.. ইহার পেছনে ইতিহাসও অতি মনোরঞ্জক। ধরাধামে কলিকালে এক ধরনের প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে যারা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে। আকৃতিগত ভাবে মানুষদের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বাকি সকলই ভীষণরকম বিসদৃশ। আসল মানুষ যেখানে ফুল, পাখি, গাছ, পাহাড়, নদী দেখতে ভালবাসত, এই মনুষ্য-সদৃশ জীব শুধু নিজেদেরই দেখতে ভালোবাসে। আমার অনুমান ইহারা বেদান্তের ‘‘আত্মানং বিদ্ধি’’ অর্থাৎ

‘‘নিজেকে জানো’’ এই মহান শ্লোকটির অনুসারি। তাই ইহারা নিজেকে জানার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কোণ থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে দেখতে উৎসাহী। এই নতুন প্রজাতির মানুষকে উত্তরমানব বা প্রায়-মানব বলা হয়। নিজেকে জানার এই ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর এবং অনধিক্রম্য হয়। প্রথম প্রথম এরা নিজেকে দেখার সাধ পূর্ণ করতে চিত্রকারকে দিয়ে নিজেদের চিত্রিত করাতো। কিন্তু সে অতি সময়সাপেক্ষ ও ব্যায়বহুল বলে বেশিরভাগ প্রায়-মানবকেই দর্পণে নিজের মুখ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। পরে এরা এক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলে যার নাম ‘‘চিত্রবন্দি যন্ত্র’’। অর্থাৎ এটা এক ধরনের ছবি ধরার ফাঁদ। এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন দৃশ্যকে ফাঁদে ফেলে বাক্স-বন্দি করা যায়। কোন কিছুর দিকে এই যন্ত্র তাক করে একটি বোতাম টিপলেই ব্যাস। সুড় সুড় করে সে দৃশ্য এসে বাক্সের মধ্যে ঢুকে যাবে, সাথে সাথে বাক্সের দরজা বন্ধ আর ছবি বাক্স-বন্দি। সে ছবি তখন বাক্সের মধ্যে যতই ‘‘ত্রাহিমাম’’ চিৎকার করুক না কেন বাক্স থেকে বেরোনর কোন পথ নেই। কিন্তু প্রথম প্রথম সে যন্ত্র আয়তনে বৃহৎ হওয়ায় নিজের দিকে তাক করে বোতাম টেপার সুবিধে হত না। তখন সাগরে, পাহাড়ে জাদুঘরে, বাজারে সর্বত্র যেকোন চেনা-অচেনা-অর্ধচেনা লোক দেখলেই এই প্রায়-মানবদের বলতে শোনা যেত ‘‘দাদা, আমার একটা ছবি তুলে দিন না’’ বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই সেই ছবি বন্দি করার কলটা তার হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে, ঘাড় বেঁকিয়ে বিভিন্ন নৃত্য বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ত। এই ভাবেই কিছুকাল ধরে এরা নিজেকে দেখার এবং তদ্দ্বারা নিজেকে জানার তৃষ্ণা মেটাচ্ছিল। কিন্তু অপরের সাহায্যের প্রয়োজন থাকায় সর্বতোভাবে নিজেকে জানতে পারছিল না অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে নিজের ছবি তুলতে পারছিল না এবং তদহেতু অবসাদে ভুগছিল। ক্রমে ক্রমে এই যন্ত্র ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে একটি আঙ্গুর ফলের মত ছোট হল। এবং প্রায়-মানবদের আর এক আবিষ্কার দূরভাস যন্ত্রের মধ্যে স্থান পেল। তখন ঐ যন্ত্র নিজের দিকে তাক করেও নিজের চিত্র বাক্স-বন্দি করা সম্ভব হল। তখন প্রায়-মানবেরা সর্বপ্রকারে নিজেকে জানতে প্রয়াসী হল। সময়-অসময়, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় এরা নিজেদের পানে ঐ যন্ত্র তাক করে নিজেদের ছবি তুলতে লাগল। ইহাই সেল্ফি। অন্যের সাহায্য ব্যাতিরেকে নিজের স্বরূপ উদঘাটন করতে পেরে ইহাদের আনন্দের অবধি থাকল না। তখন মন্ত্রিমশাই থেকে মুচি-কসাই, টাটা-বিড়লা থেকে গরিব চা-ওয়ালা, রাজনীতিকার থেকে চোরপকেটমার, রাজা-গজা থেকে ভুমিহার প্রজা, কেষ্ট -বিষ্টু থেকে পটল, কেয়া, মিষ্টু সকলেই ঘুমানোর সময়টুকু ছাড়া সর্বক্ষণ সেল্ফি তুলতে থাকল। এমনকি কিছু কিছু প্রায়-অতিমানব গতিমান ট্রেন-এর সামনে বা উঁচু ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে সেল্ফি দ্বারা নিজেকে জানার প্রয়াস করে হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হল না। শুধু তাই নয়, ইহারা এই পর্বত প্রমাণ সেল্ফি বা নিজস্বী সকলকে ইহাদের আর একটি আবিষ্কার আন্তর্জালের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে মর্তলোকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে একই সাথে সকল ভূভাগে দৃশ্যমান হল।

এবং এক ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সবাই একে অপরকে অপূর্ব সুন্দর কিম্বা সুন্দরী বলে বাহবা দিয়ে নিজেদের আত্মগরিমা পুনঃপুনঃ উজ্জীবিত করতে থাকল। তখন প্রায়-মানবেরা সোহম্ অর্থাৎ ‘‘আমিই সেই ব্রহ্ম’’ সেই পরম বোধে উত্তীর্ণ হয়ে আত্মজ্ঞানী হল। সচ্চিদানন্দের কৃপায় সৎ অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে নিজের চিৎশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির সহায়তায় সেল্ফি আবিষ্কার করে এই প্রায়-মানবেরা আনন্দ লাভ করল এবং অনন্ত-আনন্দ-কারণ-সাগরে নিমজ্জিত হল।

সুচিপত্র

ঈশানকোণ

অণুগল্প

মাস্টারদার অনুগামী

অজয় বৈদ্য

অনন্তবাবু ত্রিপুরা থেকে কলকাতা গেছেন একটা বিশেষ কাজে। গড়িয়াহাটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছেন। হঠাৎ চোখ পড়ে ফুটপাথের এক ভিখারির দিকে। একটা থালি সামনে ধরে ভিক্ষা চাইছে। কেউ কেউ দয়া করে এক-দুই টাকার কয়েন ছুড়ে দিচ্ছে থালিতে। অনন্তবাবু দয়াবশত একটা এক টাকার কয়েন ছুঁড়ে দিতে গিয়ে চোখ পড়ে ওর মুখের দিকে।

-- তুমি বিনোদ না?

-- অনন্তদা না?

-- হ্যাঁ। তোমার একি অবস্থা! আমরা তো সবাই জানতাম তুমি সেদিন পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গেছ। সূর্যদা আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম হিলে আশ্রয় নিতে - পেছন ফিরে না তাকাতে। ব্রিটিশ পুলিশের দল আমাদের অনুসরণ করছিল।

-- আমি সব জানি। মাস্টারদার নেতৃত্বে সেদিন চট্টগ্রামের ব্রটিশ অস্ত্রাগার লুট করতে গিয়ে আমি পুলিশের গুলি খেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় জঙ্গলে গা ঢাকা দিই। সেদিন থেকে চিরদিনের জন্য প্রতিবন্ধী হয়ে যাই। আমাদের অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার পর আমরা কেউ ত্রিপুরা কেউ আবার কলকাতা চিরদিনের মত চলে আসি। তুমি কোথায় বাড়ি করেছ?

-- ত্রিপুরা।

-- তোমাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সরকার ভাতা দেয় না?

-- না। আমি চাইনি। সংগ্রাম করেছি নিঃস্বার্থভাবে দেশকে ভালবেসে।

-- তুমি থাক কোথায়?

-- এই ফুটপাতে।

দুই জনই উত্তেজনায় ফুঁসতে থাকে। অনেকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই।

-- আমি কাল এ সময় এখানে আবার আসব। তোমার সাথে দেখা করব।

এ কথা বলে অনন্তবাবু চলে যায়।

পরদিন অনন্তবাবু বেশকিছু টাকা নিয়ে এখানে এসে দেখে -- বিনোদ এখনো আছে, তবে জীবিত নয়, মৃত।

সূচিপত্র

অণুগল্প

রাকার ছুটির দিন

সদানন্দ সিংহ

রাকা টিউশানি সেরে মাস্টারের বাড়ি থেকে ফিরেছে এই কিছুক্ষণ আগে। মা ওকে মাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বাবা ওকে নিয়ে এসেছে। আজ রবিবার। তার স্কুল ছুটি, বাবার আপিস ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনে রাকার কাজ আরো বেড়ে যায়। হোম ওয়ার্ক থাকে। ছবি আঁকার স্কুল থাকে। টিউশানি থাকে। কিছুদিন আগে মা বলছিল, কী এক কম্পিউটারের কোর্স করাবে। খেলাধুলো করার আর সময় পায়না রাকা। এখন রাত সাতটা। বাবা কোথায় জানি বেরিয়ে গেছে। মা রান্নাঘরে তার জন্য টিফিন তৈরি করছে। কিছুক্ষণ পর মা ওকে নিয়ে আবার পড়তে বসবে। মায়ের মোবাইলটা টেবিলের ওপর আছে। রাকা মোবাইলটাকে তুলে নেয়। টম বেরিয়ে এসে বলে, হ্যালো। রাকা উত্তর দেয়, হ্যালো টম। আমি একটু কার রেসিং খেলছি। তারপর আবার কথা বলছি তোমার সঙ্গে। টম

উত্তর দেয়, নো প্রবলেম। গো অ্যাহেড। রাকা কার রেসিং খেলে। খেলতে খেলতে তার চোখ একটু ঝাপসা হয়ে আসে। ইদানীং কেন জানি এমন হচ্ছে। মা-বাবাকে সে কিছুই জানায়নি পাছে মোবাইলটা যদি না ধরতে দেয়। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ঘরে ঢুকবে। রাকা তাড়াতাড়ি কার রেসিং শেষ করে। তারপর আবার টমকে বলে, হ্যালো টম। হাউ আর য়্যু? টম উত্তর দেয়, আই'ম ফাইন। বাট হাউ আর য়্যু? রাকা উত্তর দেয়, আই'ম নট্ ফাইন। আমার চোখটা প্রায়সময়েই ঝাপসা হয়ে আসে। বাট নো প্রবলেম। সী য়্যু এগেইন। বাই। মোবাইলটা আগের জায়গায় রেখে দেয় রাকা। মা এখুনি টিফিন নিয়ে ঢুকবে।

সুচিপত্র

ব্রতীন বসুর কবিতা

উৎসব

আজ ছোড়দির জন্মদিন
বাবা বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন
কাকটা জানালা দিয়ে উঁকি মারছে
মাংসের ব্যাগে মুখ দেবে বলে
দূর হ হতচ্ছাড়া।

যেদিন প্রথম ওড়ে পাখি
ওর জীবনে ওই এক দিনই
উৎসব।
মা খেতে দেয় ওই দিন পর্যন্ত।

নেশা

আমি ভয় পাই যে শব্দকে তার নাম
মৃত্যু,
অথচ এই শব্দের এক নিজস্ব নেশা আছে
কিছু করতে পারব না জেনেও রাস্তায় এক্সিডেন্ট হলে ভিড় ঠেলে দাঁড়াই
একটা আত্মহত্যা অথবা দুর্ঘটনার কাহিনি থাকলে
আগ বাড়িয়ে টেনে নিই খবরের কাগজ,
টিভির রিমোটটা,
অমুকদার চাকরি গেল, তমুকদি ছেড়ে দিল গান
এই সব জানতে শুনতে শোকার্ত হতে টানে
ভয় পাই সব প্রকারের মৃত্যুকে,
যেন সিগারেট
আমার ফুসফুসটা বেঁচে থাক
ক্যান্সার থাক চেনা পরিচিত গল্পে
শোকে আমি সাদা পরতে রাজি আছি।

সূচিপত্র

বিদিশা দাসের কবিতা

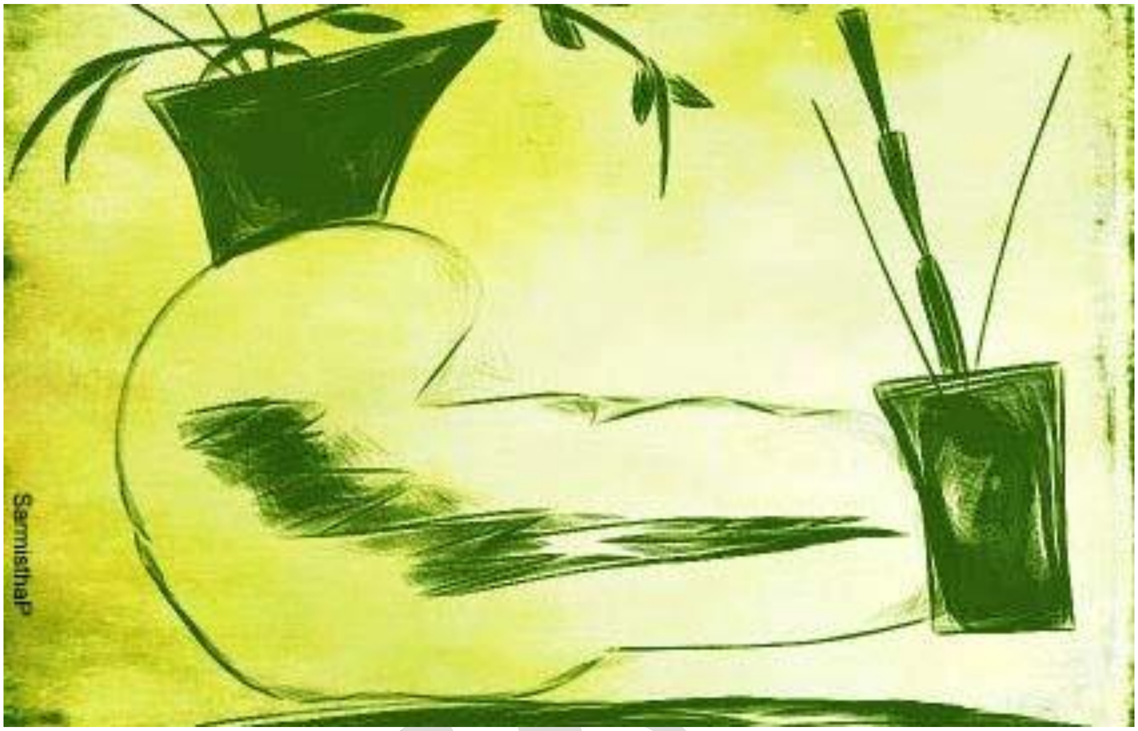

কী হল, কী হবে দিন

ভেবেছিলাম চেষ্টা করতে করতেই একদিন নিশ্চয়ই ভালো থাকব,
এক জানালা আলো আর আশা দিয়ে
একঘর আঁধারিয়া রঙ ঢেকে দেব,
স্বপ্নের মত যেন লাগে এই সবকিছু।
এই বেঁচে থাকা যেন পোতাশ্রয় খুঁজে চলে,
কী হবে এই বিকেলের মত বিকেলবেলা নিয়ে,
কী হল এই রোদ-দুপুর, রোজ-দুপুর নিয়ে!
কী লাভ এই আসছে বসন্তবেলার ভোরাই গান দিয়ে।
আমি তো পারিনি একটুও অনুভূতির রঙে সাজাতে ভালোথাকাটুকু,

শুধু চেষ্টা করতে পারি এইতো!
কী হল, কী হবে দিনগুলো বড় দীর্ঘ, ব্যঞ্জনাময়।
তবুও এক জানালা আলোর স্বপ্ন ছুঁয়ে বেঁচে আছি একজীবন।
অপেক্ষায় রয়েছে পোতাশ্রয়?
আমি চেষ্টা করে যাব,
মুঠোতে ভরে নেব অনন্ত ব্যথা,
নতজানু হব নিবেদনে কবিতা ঈশ্বরীর কাছে,
রাখালিয়া বাঁশিতে তখনো ডাক দেবে আজন্ম আমার জন্য মাপা কী হল, কী হবে দিন!

লোভ

ভালোবাসবেনা জানি!
তবুও সোনার হরিণের লোভটুকু বড় মোহময়,
মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যাবার আগেও
উতলা শব্দ সাজায় সব অপেক্ষার মুহূর্ত।
এক অমোঘ নিয়মের আকাশ চেয়ে থাকে নির্নিমেষ।
ভালোবাসবেনা জানি!
তবুও অপেক্ষা করে অবুঝ হৃদয়।
রাইকিশোরী অভিমানটুকু নিঃশব্দে বৃষ্টি ঝরায়
বুকের ভিতরঘরে বড় লোভ নিয়ে,
জানি সব মিথ্যে -
নিশ্চুপ অপেক্ষা, চুপচাপ রক্তাক্ত ব্যথা!
তুমি আর ফেলে আসা রূপকথা
কিছুই ফিরে আসবেনা জানি।
ভালোবাসবেনা জানি!
তবুও লোভটুকু বড় মধুময়।

সূচিপত্র

কল্পকোণ

এ কে এম আব্দুল্লাহের কবিতা

বিস্মৃতির একটুকরো গল্প

মাঝেমধ্যে সান্নিধ্যগুলো অ্যালবামে
রাখা ছবির মতো প্রীতিময় হয়ে উঠে
আর আমি দাঁতে ঠোঁট চেপেধরা যুবকের মতো
দৃষ্টির পাতা উল্টোতে থাকি।
সময় বড়ই নিষ্ঠুর টিটকারি মারে দু:সহ স্মৃতি।
আমি জলজ ফুলের গন্ধ মেখে
পুরোনো জোছনার মাপজোক করি।
থৈথৈ ভরা বেদনার উচ্ছুল তটে
মুখরিত স্বপ্নেরা মিছিল করে। আর
তোমার হাতের নট দেয়া টাইয়ের সময়টুকু
সাজিয়ে রাখি আলমিরার তাকে।

রাতের অজান্তে আবেগের আঁখিকোণে জমে
ফোটা ফোটা অশ্রুকণা। ক্ষণিকের তরে
যাই হারিয়ে, আর আমার চোখের সম্মুখে
দৃশ্যায়িত হতে থাকে প্রাক্তন কিছু সময়ের স্থিরচিত্র।

দীর্ঘ রাত্রি শেষে

মাঝে মাঝে কয়েক পঙক্তি ভালোবাসা
এটিএম থেকে উঠে আসে আমার
বুকপকেটে। আর তুমি জড়িয়ে রাখো
আমাকে তোমার বুকের উত্তাপমেশিনে;
যেখানে, দেওয়ালহিটারের উষ্ণতা হয়ে যায় বিলীন।
আর আমাদের মুখ থেকে ঝরে পড়া
লালায় উড়ে নতুন নোটের গন্ধ।
টেবিলের উপর রাখা চেকবই থেকে
উঠে আসে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি। আর
আমাদের ঘিরে ধরে ফুলের মতো।
আমরা লাল, হলুদ আর গোলাপি হতে থাকি।
এভাবে রাত শেষ হয়ে যায়। আর চামড়ার
ভাঁজ করা পকেটকোষে, পড়ে থাকে
মেয়াদ উত্তীর্ণ কিছু পুরু কাগজের ফলক।

সূচিপত্র

কবিতা

গ্রাম্যভিলা
ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

ঘাসের মধ্যে মাথা তোলে ড্যান্ডেলিয়ন ফুল,
অল্পস্বল্প বৃষ্টি হাওয়ায় খুশিতে ভরপুর;
ভুবন তার সীমাবদ্ধ, ঘাস কি ব্যথা বোঝে?
অস্তসূর্য ছড়িয়ে দিল বিদায়বেলার আলো-
আগামীকাল পাপড়ি ঝড়ে যাবে, তবু ফুল
হেসে ওঠে, স্বাগত জানায় পরম আহ্লাদে।

অযত্নমাঠ পেরিয়ে এখন বাড়ির মধ্যে আমি,

মলিন মেঝে জানালা দেয়াল খিলখিলিয়ে হাসে
কড়ি বরগা ছুঁয়ে নামে হাজার মাকড়শা;
ধুলো ঝাড়ি, লম্ফ জ্বালাই, সামোভারে
ফুটতে থাকে জল; থেকেই যাবো বেশ
কিছুদিন গ্রাম্য ভিলায় কোলাহলহীন;
চাই না বড় শহর কোন হাতছানি দিক।

প্রকৃতি আজ ছড়িয়ে আছে নুড়িপাতা
পথের মতো চারপাশেতে।

সূচিপত্র

কবিতা

কোনটা

রূপক গুহ

চোখ বুজে অক্ষর বুঝে এখনও তোমার নাম লিখি। হারিয়ে যায়নি মানুষের ভিড়ে। তবে এবার হারাবো রৌদ্রের মাঝে। এখন শব্দের টানাটানি। যারা চির নতুন, সভ্যতার আ-দিগন্ত বয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। অনেকেই খুঁজে পাইনা জীবনের রসদ। মোড়ের গা দিয়ে যে পথ ঘুরে চলেছে উত্তরে, সেই পথে ফাগুন হাওয়া আসত আগে উত্তুরে শীত হাওয়া লাগতো। কেননা তখন আমি গায়ে কম্বল চাপাতাম। এখন গরম, তাপের অত্যাচার চলছে। এদিকে সব গাছ মুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুড়িয়ে কেন বলবো আর, হত্যা করা হচ্ছে সবুজকে সভ্যতাকে। কাল যখন তুমি পথে বেরুবে, দেখবে শুন্যতা চারিধারে। এতো আলো চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তোমার যাওয়ার পথে কোন সাথী থাকবেনা, বৃক্ষও যাবেনা পথের সাথে টক্কর দিয়ে। এটা কী জীবন এগোচ্ছে ! না সমাজ সভ্যতা আপগ্রেডেড হওয়ার নেশা ! কোনটা..?

সুচিপত্র

আনিস আহমেদের কবিতা

খাদ

খাদের নিচে নেমে গেল একজন
পুরুষ মানুষ,
আর, খাদের ওপরে দাড়িয়ে একজন মেয়ে
তার চোখে কোনও বিস্ময় নেই
কেবল বিদঘুটে হাসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে রহস্য
আগাপাশতলা,
পুরুষ মানুষটি ভালোবেসেছিল মেয়েটিকে,
গভীর
খাদের নিচে দাড়িয়ে সে পুরুষ মানুষ
বুঝেছিল চোখে চোখ রেখে মেয়েটির,
ভালোবাসা আসলে খাদের মতো, ওপর থেকে
ঝুলিয়ে রাখা সুতোয় হাস্যকর ছলনা

খাদের ওপরে দাড়িয়ে থাকে পরী, সে ঈশ্বরী
নিচে দাড়িয়ে পুরুষ মানুষ, গলা খুলে চিৎকার করি....

তোমার ছায়ায় দাড়িয়ে

তোমার ছায়ায় দাড়িয়ে আমি কথা বলি
আর, অন্ধ হয়ে আসে আমার চোখ, ক্রমশ ....
সামনে এগোনোর পথ আমার জানা নেই
নিজস্বতা বলতেও আমার আর কিছু নেই
সবকিছু হারিয়ে তোমার ছায়ায় দাড়িয়ে আছি

তুমি কাঁপলে আমিও কেঁপে উঠি
তুমি বসে পড়লে আমিও বসে পড়ি
তুমি হাঁটলে আমি তোমার পিছন পিছন হেঁটে যাই
তুমি থামলে আমিও থমকে দাঁড়াই,
বস্তুত তোমাকে পিছনে ফেলে এগোনোর
সক্ষমতাই নেই আমার,
তাই, তোমার ছায়ায় দাড়িয়েই আমি কথা বলি...

সিঁড়ি

ফুটপাথে পড়ে থাকে যাদের কপাল
আর যারা পা দুলিয়ে
বাদামের খোসা ছাড়ায়
এদের মধ্যিখানে যারা হাঁটু গেড়ে তাস খেলে

এদের প্রত্যেকের মাথা দেখতে
সিঁড়ির ধাপের মত, অবিকল

রেলিং ধরে আমি কপর্দকহীন রাজা
সিঁড়ির ধাপগুলোকে স্থির দেখে হেসে উঠছি
দেখছে না যদিও কেউ আমার খোলাদাঁত
কিভাবে ফালাফালা করেছিল শ্রেণিকঙ্কাল
ফালাফালা করে যেভাবে 'মরমি করাত'

ঈশানকোণ

সূচিপত্র

তৈমুর খান এর তিনটি কবিতা

সমস্ত দিন শিকারির উল্লাস

জল উঠছে না জল নামছে ?
নিজস্ব সংশয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকি
পাখি মরে যায়
আজ শিকারির দিন
আবেগে ঝাপটে ধরি জলের নকশাকে

কিছু নরমুণ্ড দিব্যি গড়ায়
কথা বলতে থাকে, দুর্বোধ্য কথারা সব

আদিম গুহার নিরিবিলি থেকে বেরিয়ে আসে

দম নিতে থাকি। এরই নাম বাঁচা ?
পোশাক খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে
জোয়ার না ভাঁটা ?
ভেজা কুসুমের মতো রমণীর গাল
মনে মনে সারারাত চাটি —
তাতেও কি স্বাদ আছে ?

বিষাদ এসেছে সব ঘরের চৌকাঠে
আর রোদ্দুর মাখা হাসপাতালে
নার্সদের মসৃণ ত্বকের উল্কি আঁকা প্রেরণায়
আমারও জাগরণ পায়

এখানেই বিহ্বলতা নাচে
নরম কোনও অন্যমনস্কতার ভেতর
আত্মদ্রোহের বাজনা শুনতে থাকি
বিশ্বাস হয় না জল ওঠানামা করে
মুকুন্দ ফুলের বাঁশির আয়োজনে
বসন্তের জানালা খুলে যায়

দেখতে দেখতে খণ্ড খণ্ড মানব জমিনে
শস্য ঘ্রাণ ওঠে
বাতাসে উড়ন্ত গান, স্বধর্ম বিলাস
সমস্ত দিন শিকারির উল্লাস...

আগুন

আগুন ছুটে আসছে
কত দূর যাব আর ?
বাঁচানো যাবে না কিছুতেই

দুইপাশে সন্ধ্যামণির বাগান
ছোটো ছোটো ঘর
জানালা থেকে আলো আসছে
সাপের মতন ফণা তুলে আছে স্বপ্নেরা সব
লম্বা সরু হাতগুলি প্রণয়ের গলা ধরে ঝুলে আছে
আকাঙ্ক্ষার দেশ ভরে আছে নতুন জাতকে
আর হাওয়ায় মেশাচ্ছে স্বর বাসন্তী বৈরাগী

আগুন আসছে দাউদাউ
নিজের ক্লান্তির ছায়ায় দাঁড়িয়েছি
আমার পার্থিব আচ্ছাদন টুকু নির্বেদ প্রহর গোনে...

আপেল বাগান

আপেলগুলি গড়ে আসছে
গড়ে গড়ে আসছে
লাল ঠোঁট মুগ্ধতা নিয়ে চলে যায়

দেখতে দেখতে বাগান পেরিয়ে যাই
হরিণেরা শিং ঘষে নেয় ডালে
লাল সূর্যের আলো চুপচাপ বসে আছে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে

এক একটা অলৌকিক নদীর মতো

যদিও মায়াবনে আছি
যদিও গার্হস্থ্য বিষাদে পোড়া মন
তবু হরিণীর মতো আমারও তীব্র এক ভাষা জেগে ওঠে
ভাষারা প্রকাশ হতে চায়
আপেলগুলি চেয়ে থাকে
সিঁদুরে আভাস চোখে মুখে —
একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি ?

কে দেবে অনুমতি ?
বিবাহিত জীবন জুড়ে নষ্ট মধুমাস
আচ্ছন্ন আঁধারে শুধু ব্যর্থ কোলাহল.....

সূচিপত্র

কবিতা

সারাদিন স্টেশনে

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাদিন স্টেশনে বসে থাকি একা
নির্জন প্ল্যাটফর্মে দু-একটা পুরোনো কুকুর....
এক ফালি রোদ ছাড়া কেউ নেই ওয়েটিং রুমে
স্টেশনের চারপাশে সাঁওতাল পরগনা, ফাল্গুন মাস
একটা গাছের তলায়, বেদিতে সারাদিন বসে থাকি
আর ফাগুনের হাওয়া মেখে
গাছে গাছে ভেসে যান স্মৃতিময়বাবু
মাঝে মাঝে ট্রেন আসে, হুইশল বাজে
কেউ আসেনা, উঠে যায়না কেউ, পানীয় জলের কলে
কোনো মুখ নেই, তাড়াহুড়ো নেই

একটা গাছের তলায় বসে থাকা শুধু ....
ভারী চাকার শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় দূরে
ছুটির সুটকেস নিয়ে কামরা থেকে হাসতে হাসতে
আমরা নেমে আসবো কোনোদিন
বাংলোর বারান্দায়, নদীর ধারে খুব হইচই হবে
আবার ম্যান্ডোলিন বেজে উঠবে রাতে -

তাই সারাদিন স্টেশনে বসে ট্রেন খুঁজি আমি .....

সূচিপত্র

ঈশানকোণ

কবিতা

যুদ্ধ

চিরশ্রী দেবনাথ

যুদ্ধ মেলেছে ডানা অস্থির লয়ে, দ্রুত খননের মতো
এখানে এখন নিস্পেষিত আকাশ, নিরাবরণ স্খলন
পাখির মনের ধুকপুক, শিকারি ব্যাধের ঝুলিতে ভরে দিচ্ছে বসন্ত প্রলাপ
থাকছে সংবাহিত রোগের কোমল বিস্তার, বিচ্ছেদের দুঃখরাগ
পুড়িয়ে দিচ্ছে, ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা এই উত্তেজনা
জ্বরের আরামের তপ্তছোঁয়া শুধু নিয়ে যাচ্ছে কবরের আচ্ছন্নতায়
সবুজ বরফের নিভৃতে সঙ্গীন শোভা
জেনে নাও এ সভা... মৃত্যুসূচী, বিউগলের শ্রদ্ধা, আকাশ কেটে নেমে আসা যুদ্ধ সংকেত
এই পুরনো উত্তেজনা জিভের ডগায় চাটতে ভালো

খবরের কাগজে সাবলীল আত্মব্যাখ্যায় নিখাদ গুপ্তচারিতা
মরুভূমি, বরফ, পাইনগাছের সড়কে থাকে খাবারের প্যাকেট,
বাতাসের তরঙ্গে চেনা নারীকন্ঠের নির্জলা উপবাস
মহান হয়ে ওঠে যুদ্ধখাদ, বিলুপ্ত শকুন সন্ধ্যা
সন্তানের ঘরে জ্বলে প্রদীপ ঝড়, শীতের ঝরাপাতা গান
রাস্ট্র দায়ী থাকে জয়ে, পরাজয়ে, ভুল সিদ্ধান্তের রক্তফলনে
এ আর এমনকি, নির্ধারিত সম্মান বিষাদের ছাউনিতে
উৎসবের মাস বুকে করে নিয়ে আসে সীমান্তের কফিন
ছররা ছুটেছে মেপল পাতায় সরবে নীরবে গোধূলির কুয়াশায়
বুটের পায়ে পায়ে হাঁটছে জননী, এ সীমান্ত দীর্ঘ, ব্যাকুল
পারমাণবিকতা চাই না কারো, এ মাটি, ওই মাটি
পশমের রুমালে ঢাকা আছে স্বাদু কাবাব
এক চামচ মুখে দাও, কমান্ডো
দেশ বাঁচাতে এসেছো, ভুলে থাকো সুগন্ধী মশলাছায়া
আরামে গলে যাক পেলব মাংস, এক মূহূর্ত তো বাঁচো!

সূচিপত্র

তুষারকান্তি রায়ের কবিতা

তবু অভ্যেস

এখনও আকাশ ভেঙে পড়ে
আমাদের ভাঙা বাকি নেই
সামনে বহর দেখি শুধু
হাঁটু জল পথে দাঁড়ালেই...

আমরা খেয়াল রাখি জল
আমাদের কোনো ছাতা নেই
মাঝি নেই, ভাসি গলাতল
লক্ষ্মী থাকেন কিনারেই...

কিশোরী রাধার সাথে ঘর
মনে গোঁজা ভালোবাসাবাসি
রাত জেগে তারা গোনা সার
মোহরে কিনেছে মাসিপিসি...

পুতুল মানুষ বেচাকেনা
হাত তুলে মিছিলের শেষ
মুহূর্তে বেঁচে উঠে মরে
বৃষ্টিতে ভেজা অভ্যেস...

রানিবালা ইস্কুল

বাৎসল্যের সমারোহ লুকোচুরি খেলতে খেলতে
নতুন জামাপরা শিশু বিকেলের
যে হাওয়াটি মুদ্রাদোষে
কাঁধে ব্যাগ – হাতে ছাতা – লম্বা বিনুনি নতুন দিদিমণির
মাথায় আলগোছে বকুল ঝরিয়ে দিচ্ছিলো
সেই তো জঙ্গলের পথ পেরোতে পেরোতে
ছায়া উন্মোচনের ভিতর দিয়ে
একপাল দামাল মেঘের মিছিল নিয়ে এলো;
এবার যেদিকে দু’চোখ যায় চলে যাবে
ছড়িয়ে পড়বে ছমছম আকাশের নিচে
আনন্দের আনাচে-কানাচে; আর
মেঘের পাতায় পাতায় কবিতা লিখে ছড়িয়ে দেবে
‘রিমঝিম ঘন ঘন রে ...’
নিশিরাতে গলা ছেড়ে গান গাইবে পূরবী-বিভাসে
গভীরে ঠিক লুকিয়ে রাখবে
সেতারের ঝালার মতো মল্লারের তান-বিস্তার;

জানলা খুলে দাঁড়িয়ে থাকা চশমা খুলে দেখার
চোখের পাতা বেয়ে নেমে আসা ঠোট ভেজা অশ্রুর
ডাকনাম ধরে ডাকতে থাকবে;

জেগে উঠবে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া রানিবালা ইস্কুল ...

ভাওয়াইয়া

এর মধ্যেই একদিন সেনগুপ্ত বাড়ির
লাল কার্ডিগান পরা রোগা বিকেলের সঙ্গে দেখা
আনমনা দুই হাতে কমলালেবুর খোসা
ছাড়াতে ছাড়াতে জগৎপার্কের
সাতরঙা হাসিখুশির পাশ দিয়ে হাঁটছিলো;
তার আনন্দের মুহূর্তগুলি যেন চাপা পড়েছিলো
ডানাওয়ালা নিঃসঙ্গতার নিচে;
কিছু প্রশ্ন করার আগেই
দু'হাত পরপর সন্দেহের গর্তগুলি পেরিয়ে
অতি সন্তর্পণে সন্ধের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ...

দূর থেকে ভেসে আসা রাতজাগা ভাওয়াইয়া গানে
কি ওর বেদনার কথাই বলছে!

সূচিপত্র

কবিতা

কালো মেয়ে

শ্রীয়া ঘোষ সেন

অমাবস্যার রাতে জন্ম তার
কালো মেয়ে!

বুঝিবা অস্তিত্বই বেকার।
বিধি বাম, মা মরল চিরতরে;
অপাঙক্তেয় কন্যাশিশু!
কেউ বুকের মাঝে রাখেনি আদরে।

সময়ের অমোঘ নিয়ম;
শিশু ক্রমে ক্রমে কিশোরী থেকে যুবতী

কালো মেয়ে!
কীই বা হবে তার গতি?
নানা কথা, নানা পরিহাস।
যুবতী বড় অভিমানী, আদর-কাঙালি
হৃদয় পায়নি কোনো সান্ত্বনার অবকাশ।
কেন জানি সমাজে সে অপয়া, অনাহুত!
শুধু অকারণ ধিক্কারে যুবতী ক্রমে বিক্ষিপ্ত।

কালো মেয়ে
জঞ্জালের মত পার পেল দোজবরে।
নির্লজ্জ কামের থাবায়, যুবতী মরমে থাকে মরে।
শরীর শোনেনি বারণ
গর্ভে তার নতুন অস্তিত্ব।
আবার করে বাঁচার তাগিদে
আশান্বিত, যুবতীর মাতৃত্ব!
নারীর প্রথম রোমাঞ্চে হৃদয় অভিভূত।

কালো মেয়ে
গর্ভের গভীরে খুঁজে ফেরে এক নতুন পরিচয়।

সূচিপত্র

শ্রীময়ী গুহের কবিতা

সাঁঝ

একলা পথ চলা
অবচেতনে -- বহুদূর আকাশের হাতছানি৷
জানলার ওপারের জগতটা - আজকাল কেমন অচেনা!
সূর্য জাগে আপন খেয়ালে

এই চারদেয়ালে এক অপরিসীম স্তব্ধতা
কুরে কুরে খায় কিশোরীর মন...
কিছু জান্তব-থাবা-নখ
আর জবরদখল...

রক্তাক্ত হৃদয় --
ততোধিক ক্ষত বিক্ষত আঁচড় --- দগদগে দাগ --- কাপুরুষ কিছু --

ভুলতে চায় মন---
ভুলিয়ে দিতে চায় আপ্রাণ এই শরীর --
স্বপ্নরা ভাঙন ধরালো বুকের নরম অন্তরে-
পাঁজরে এখনো কেন বিজুলি চমক
কেন এমন হাহাকার ----

আজও তো
একই ভাবে গোধুলি ঢলে রাতের আদরে
আজও তো
প্রতিটি ভোর অভিসারী দুচোখ মেলে চায় --
তবু
কিশোরী সাঁঝ -- কেন এমন প্রতিহিংসায় ঝলসায়!
কেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষত স্বাধীন লৌহযোনির প্রতীক্ষায়!

সূচিপত্র

কবিতা

বন্দুক ছিল

সুব্রত দেব

বাঘ মারব বলেই আমি বনে গিয়েছিলাম।
আমার হাতে বন্দুক ছিল,
বন্দুকে গুলিও ছিল।
এখন একটা গুলিও অবশিষ্ট নেই ।
এর মানে আমি বাঘ মেরেছি।
ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করো
ইচ্ছে হয় না, করো না।
দোহাই তোমাদের,

একের পর এক বেয়াড়া প্রশ্ন তুলে
আমার প্রেশার
আর বাড়িয়ে দিয়ো না ।

সুচিপত্র

মেঘনা চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

মুক্তিপাঠ

দেওয়াল ঢেকেছে ফ্রেমে আঁকা পোর্ট্রেট
গোলাপগুচ্ছ ক্যাবিনেট জোড়া ভাস-এ
ঘর ভরিয়েছি ভিনদেশি আসবাবে
তোর কথামালা সাজিয়েছি তার পাশে
মানিয়েছে দ্যাখ দিব্যি নান্দনিক
জোড়াতালি ফাঁকি খুঁজে পায় কার সাধ্যি
শব্দেছন্দে ঠোঁট ছোঁয়াছুঁয়ি খেলে যায়
বাকি সেইসব পুরনো গল্প বাদ দিই
আরো একদিন অফিসে যেদিন কাজ নেই
সোশ্যাল সাইটে পরানবন্ধু খুঁজব
আরো একদিন পরাগ ছড়ানো বিকেলে

আবারো নাহয় এরকমই ভুল বুঝব
তোর নীলমেঘ তোর বুকভাসি জ্যোৎস্না
আরো কিছুকাল তোর দেরাজেই পড়ে থাক
চলি রে, আবার কথা হবে ঠিক কোনোদিন
আপাতত মেঘডানারা উড়ান ফিরে পাক।

সূচিপত্র

অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা

শ্রেয়তর

মানুষ বাড়িতে না থাকলে গাছ
মানুষ বাড়িতে না থাকলে পাখি
বনের গন্ধ ছড়িয়ে যায়
দীর্ঘ দিনের মঞ্জরীর ক্ষুধা
আগ্রাসী হয়ে ওঠে
কতদিনের প্রতিশোধ

ঝুঁকে আসে মেঘ
ডেকে উড়ে যায়
আনন্দ প্রেম লতার মতই আয়ু পায়

মানুষ না থাকলে আকাশ
মানুষ না থাকলে রোদ

দীর্ঘ রাতের অবসাদ ভেঙে
ঝরে ঝরে পড়ে
তার দিগন্তের পিপাসা
অনেক কাজের বাকি
দ্রুত ঢেকে দিতে হবে সবুজাভায়

মানুষ আসার পর যাতে চেনে না বাড়ি
ফিরে যায়--
নতুবা ভাবে এ কার বসত
এ কার বাড়িতে এলাম
এত গাছ এত পাখি আকাশ
এই যদি হয় সুন্দর
তবে শ্রেয় বনবাস

এ লেখাটি

এ লেখাটি আপনার ছায়ায় বসেই লেখা
এ লেখাটির গায়ে আজব চীজ--
রাঙতায় মোড়া শহরের ভিড়-- সেল্ফি
ক্লিক্ ধাপ্পাবাজি--
আপনার প্রিয় পানীয়--
আহা! গলে গলে নামছে পাকস্থলীতে--
এই লেখাটি কী হট্!
আপনার মত বরাবর
পায়ের উপর পা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে--
খালি দেখুন, এখনো কচি--
রড ঢুকিয়ে দেবেন না

সূচিপত্র

কবিতা

পুরোনো মাস্তুল

অঞ্জন বর্মন

জমে ওঠে বিকেলের মেঘ
স্বপ্নেরই ছিল যত দোষ
দুপুরের হারানো আলোরা
পরে নেয় রাত্রির মুখোশ

এরপর অচেনা আকাশে
চিনে নেওয়া জ্যামিতিক পথ
পড়ে থাকে আমার শহর

দৃঢ় হয় লুকানো শপথ

বাক্সয় জমে ওঠে ধুলো
চিঠিরা মৌন হয় শুধু
সাফল্যে বেড়ে যায় বুক
চন্দ্রে জমাট হয় মধু

তাও থাকে একলা নদীর
মিশে যাওয়া অশ্রুর আলো
নতজানু সময়ের পাশে
খুলে নেওয়া স্মৃতির পালক

অপেক্ষার শেষ চাওয়া ভুল
জেগে থাকে অন্ধকারে পথ খুঁজে ফেরা
বেঁচে থাকে পুরোনো মাস্তুল...

সূচিপত্র

কবিতা

সতী

রুদ্রশংকর

কলেজে প্রথম দেখি, হাতে তার একগুচ্ছ বই
এক পা’ এগোলে, ইচ্ছে হয় আর এক পা’ এগোয়

হাতে তখন খুন হওয়া, পুড়ে যাওয়া মাংসাশী ছাই
মতিগতি ভাল না তখন, পাথরও বৃষ্টি হয়ে যায়

ওটুকুই বর্ষা আনে চোখে, ওটুকুই দরজা খোলা পাবি
ও মেয়ে, আসিস না আর... এলে সতীত্ব হারাবি !

সূচিপত্র

ছড়া

জাগ্‌লিং থট

দেবীস্মিতা দেব

কাজ যদি হয় উৎপটাং
ফেল সেরে তা
পটাং পট্‌,
করিস যদি ছটফটাং
কর তবে তা
ছটাং ছট্‌।

হোস্‌ যদি তুই চিৎপটাং

উঠেই পড়িস
চটাং চট্,
ভাঙিস যদি মটমটাং
শব্দ হবেই
মটাং মট্।

আওয়াজ পেলে খটখটাং
যাস চলে তুই
খটাং খট্,
জলে ভরা ঘটঘটাং
খালি হলেই
ঘটাং ঘট্।

কাজ যদি সব ঝটপটাং
সারতে পারিস
ঝটাং ঝট্,
খুলেই যাবে জটজটাং
যতই আছে
জটাং জট্।

সূচিপত্র

কবিতা

৭৮ সালের সেই বৃষ্টি

তৃষ্ণা বসাক

৭৮ সালের সেই বৃষ্টিটার কথা
কেউ ভুলতে পারছে না,
চারদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিল,
খাটের নিচে
পাওয়া গিয়েছিল তিমি মাছ!
মেঘের ঘন বুনোট
মশারির মধ্যে বসে
সবাই কি সুন্দর
তিমি মাছ ভাজা দিয়ে খিচুড়ি খেত!

এসব যিনি বললেন,

ঝড়ের ডানায় চাপা
নখের যুগ্যি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে -
তাঁর হাঁটুর ধুলো নেবার খুব ইচ্ছে ছিল,
কিন্তু শিয়ালদায় নেমে
তাঁকে আর খুঁজেই পেলাম না!
৭৮ সালের সেই বৃষ্টির মতোই
ভিড়ের মধ্যে
তিনি
কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন!

সূচিপত্র

নিবন্ধ

যৌনতা ও বাংলা কবিতা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

যৌনতা কথাটি শুনলেই এখনও অনেকেই কানে হাত দেয় কিন্তু এরাই আবার গোপনে নীল ছবি দেখেন কিংবা সুযোগ পেলে অন্য কিছু করে ফেলেন। যৌনতার পাঠ প্রতিটি নারী পুরুষের নিজস্ব একটি ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। রাধা কৃষ্ণ এবং হর পার্বতীর মধ্যে যে প্রেম এবং যৌন আবেদন তা কবির কবিতায় উঠে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। শোপেন হায়ার তার " Metaphysics of the love of Sexes " এ যেখানে বলেছিলেন - পুরুষ-প্রেমের কেন্দ্র ও গন্তব্য হল শরীর, শরীর তার প্রেমের শীর্ষ; নারী শরীরের মাধ্যমে প্রেমের জন্ম দেয়, তাই তা ক্রমবর্ধমান: এই

বক্তব্যের সমর্থন পাই কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে। পুরুষের কবিতার যৌন প্রবণতায় নিহিত আছে অবচেতন ভয় ও পরাজয়। নারীর কবিতায় যৌনসংকেতের ভেতরে প্রত্যক্ষ সমাজ বিরোধিতা ও স্বেচ্ছাচার লুকিয়ে আছে। কবি কিটস্ লিখছেন ,

"The day is gone, and all its sweets are gone!
Sweet lips, soft hand, and softer breast "

নারী শরীরের স্পর্শ প্রলোভন উত্তীর্ণ হয়েছে প্রেমের প্রশান্তিতে। আবার আমার দেশের কবি লিখছেন "মূর্তি না মাটির নারী / ছোটো শক্ত স্তন / ফোঁটা ফোঁটা মধুপাত হয় "। এই চিত্রকল্প কবির আশ্চর্য কুশলতার প্রকাশ। কবিতায় যৌনতা কিন্তু পর্নোগ্রাফি নয়। পর্নো বা পানুছবিতে যেভাবে একজন নারীর বিনির্মাণ ঘটে তা কবিতায় কখনো হয় নি। বরং নারী এখানে দয়িতা বা প্রেমিকা। তার প্রতিটা অঙ্গের জন্যই কবির প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে।

কালিদাস কুমারসম্ভবে বললেন:-
"অনোন্যমুৎপীড়য় দুৎপলাক্ষ্যাঃ স্তনদ্বয়ং পান্ডু তথা প্রবুদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য মৃণাল –সূত্রন্তরমপ্যলভ্যাম।''

আবার বিদ্যাপতি আশ্চর্য সুন্দর কৌশলে লিখলেন,
''উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শারদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু।''

কালিদাস এবং বিদ্যাপতি দুটি ক্ষেত্রেই নারীদেহের বর্ণনা প্রাকৃতিক, মনস্তাত্বিক নয়। রমেন্দ্রকুমারের "একটি মিশকালো ব্রেসিয়রের মধ্যে বসে চারটে বেড়ালের বাচ্চা ...." কবিতার অন্তর্গূঢ় চেতনা প্রবাহ প্রাচীন কবির রচনায় অনুপস্থিত।
কবিতা সিংহের কবিতা সাহসী অভিব্যক্তির প্রকাশ এবং এই প্রকাশ যথার্থ লিঙ্গ ভেদের সীমা লঙ্ঘনের সচেতন প্রয়াস এবং এই চাপা যৌনতা নজর এড়ায় না পাঠকের।

''হরিণী না জানে ঘর কোথা রে হরিণ?
একতারা হয়ে যায় তার ছিঁড়ে বীণ

শিখা খায় লক লক
আগুনে আহুতি হোক
চোখ নাক স্তন ত্বক মাংসের ঋণ
বৈরী অপনা মাসে হরিণা অচিন।

কিংবা
শমীবৃক্ষে শস্ত্র খুলে রাখো
খুলে রাখো রমণী ধরম্
কিম্পুরুষের সঙ্গে ঘটে যায় পৃথিবীর
সমস্ত অফলা সঙ্গম।”

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর কবিতায় যৌনতা আসে কখনও বৈধ বা অবৈধতার তৃপ্তি নিয়ে প্রতিদিনের রক্তাক্ত জীবন যাপনের মধ্যে:-
শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে ফিরে / আসি শরীরের কাছে / কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে / শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি / মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি / কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে। (হিমযুগ)

কবি এখানে শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন সেই শরীরের কাছে ।

একসময় পশ্চিমবঙ্গে জীবন শৈলী নাম যৌনশিক্ষা চালু করা হয় যুগের দাবি মেনে কিন্তু চাদ্দিকে শুধু গেল গেল রব ওঠে। এটা হলে হয়তো কিছুটা ধর্ষণ মানসিকতার পরিবর্তন হতো। আজ নেটের দৌলতে যৌনক্রিয়ার পানু পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না ।
পঞ্চাশের কবিদের একেবারে বিপরীত বিনয় মজুমদার। তার কবিতার ভেতরে যে যৌনতা তা আবহমান নারী পুরুষের মিলন মাধ্যম এবং তা যথেষ্ট সাংকেতিক:-
আমার ভুট্টায় তেল মাখতে মাখতে চাঁদ বলল, / 'তোমার ভুট্টাটি বেশ মোটা' আমি তার জবাব না দিয়ে / অন্য কথা বললাম -'ভুট্টার মাথায় একটু তেল মাখো' তবে / চাঁদ মাখল না শুধু চারপাশে গায়ে মাখে, / তেল মাখা হলে / চাঁদ মেঝে থেকে হেঁটে বিছানায় এসে শোয়, / বিছানা মেঝেই পাতা থাকে। / বালিশে মাথাটি রেখে পা দুটিকে তুলে ধরে শুয়ে পড়ে, / আমি / হাঁটু গাড়ি, দু হাঁটুর নিচে দিই খুলে রাখা / গরম প্যান্ট ও জামাটিকে। / তারপরে গুহা দেখি গুহাটি বন্ধই আছে, / দু ফাঁক করলেই গুহা / সম্পূর্ণ বন্ধই থাকে, চাঁদ শোয়া অবস্থায় হাত দিয়ে / ভুট্টাটি ধরতে গেলেই

/ আমি তাকে বললাম "দাঁড়াও ভুট্টাটি আমি নিজেই / ঢোকাতে পারি কি না / দেখা যাক' বলতেই ভুট্টাটিকে চাঁদ আর ধরল না, / ভুট্টার মাথাটি / গুহার বোজানো মুখে চেপে দিই সঙ্গে সঙ্গে / সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি / ভুট্টাটি সহজভাবে ঢুকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা / শুরু করি।" (কবিতার খসড়া)

বিনয়ের যৌনতা চলিষ্ণু জীবনের ব্যালেন্স একেবারে পুরোপুরি। এবার আমরা ষাটের কবিতায় যেখানে যৌনতা স্পষ্টবাক, শরীরী সৌন্দর্য অনুপস্থিত। আত্মপ্রত্যাখ্যানশীল যৌনতা ছিল ষাটের কবিতায়। মলয় রায়চৌধুরী যেখানে লিখছেনঃ-
ওর স্তনে অন্তর্বাস ছিল না কখনও ব্লাউজ কাকে বলে জানে না / শাড়ির আসল রং হয়তো ও নিজেও ভুলে গেছে / আঙুল দিয়ে টের পাই ওর চুলের জট / আমি বুঝতে পারি আমি থির থির করে কাঁপছি / হাত ধরে পাট ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে যায় / আমার জামাপ্যান্ট খুলে দেয় / আমি চাই / আমি চাই না / মাঝরাতের প্রাঙ্গণে আমরা দুই উদোম / আমি এরকম নারীর সঙ্গম করি নি কখনও / স্তব্ধতা- ফাটানো চিৎকারে দুর্গন্ধের শতছিন্ন / নারী জড়িয়ে ধরে। (অভিজ্ঞতার মৃত্যু)

মলয়ের নারী অসুন্দরের বার্তা বয়ে আনে। বার্তা আনে সেই জীবনের, যে জীবনে কামনা এসেছে ভয়াবহতা নিয়ে হয়তো বা প্রয়োজনে।
সত্তরের&#0; জয় বা রণজিতে লক্ষ্য করা যায় বেশি মাত্রায় যৌনতা কিন্তু সেখানে নিজস্বতার অভাব ছিল না।
রণজিৎ লেখেন:-
রাত্রি দিন চুমু খাবো, বুকে জাপটে, মুখ থেকে মুখে / ভরে দেব অক্সিজেন, মধু, মদ, সিংহির কামনা / আমার কঙ্কালটিকে দুহাতে জড়িয়ে রেখে, তুমি থাকবে অনন্ত যৌবনা। (ইচ্ছে)
আবার জয় লিখছেন:-
"এতই অসাড় আমি চুম্বনও বুঝি নি। মনে মনে দিয়েছিলে, তাও সে না-বোঝার নয় - / ঘরে কত লোক ছিল, তাই ঋণ স্বীকার করি নি / ভয়, যদি কোনো ক্ষতি হয় "

এবারে আসি মেয়েদের কবিতায় কিভাবে উঠে এসেছে যৌনতা। দেবারতি মিত্রের যুবকের স্নান বর্ণনায় দেখিঃ-
আবিষ্টা যৌবনা জল উড়ে এসে
ভেঙে দেয় তাকে
ভেঙে ভেঙে নিয়ে যায়

সাদা পাথরের প্রাকৃতিক কারুকাজ
ঘুমন্ত উরুর একখানি
স্তব্ধ গর্ভে
টেনে নিল দূর পাহাড়ের জন্মদেশ

মিতুল দত্তের কবিতায় আমরা পাই শরীরী বিভার খোলামেলা নতুন মাত্রা। অতি স্পষ্ট ভাবে মিতুল বলেনঃ-

যেভাবে বুক দুটোকে বেঁধে রাখিস
মনে হয় ওরা তোর মেয়ে
একটুখানি ঢিলে দিলে বেয়াড়া অসভ্য হয়ে
ডেকে আনবে পাড়ার ছেলেদের

স্নানের সময় যেই খুলে দিস
হুটোপাটি করে ওরা স্নান করে
কেউ কাউকে একটু কষ্ট না দিয়ে
যে যার মতো একা (দুর্বার জন্য কবিতা)

আবার পুরুষ অঙ্গের বর্ণনা রাজশ্রী চক্রবর্তী এভাবে লেখেনঃ-

ডিম পাঁউরুটির মত জীবনে, তুমি এলে / একটি হলুদ রঙের কলা / নিটোল আকার দেখে, বিশ্বাস করো, / ভারি খিদে পায়"

উদহারণ অজস্র। এখনকার যারা কবিতা লিখছেন তারা মনে হয় আরো বেশি সাহসী এবং সরাসরি যৌন অঙ্গ তাদের কবিতায় বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় চলে আসছে। এটা কেউ খারাপ ভাবে নিলে খারাপ লাগে। যা অনিবার্য যা সত্য তা মেনে নিতে হয়। আমাদের কবিতা বিশুদ্ধ হয়ে থেকে যাবে চিরকাল না তাকে গতানুগতিকতার বাইরে নিয়ে যাব এবং আরো সাহসী প্রকাশ সবকিছু ভেঙে চুরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটা ভাববেন ভাবীকালের কবি। স্বল্প পরিসরে বাদ পড়ে গেল গোটা বাংলাদেশ যেখানে বিপ্লব করছেন এ যুগের কবিরা। আমি শুধু একটি উদহারণ রেখে শেষ করলাম এই আলোচনা । মাসুদার রহমানের কবিতাটির নাম "সিংহ"।

“সিংহীটির পাশে শুয়ে আস্তে আস্তে সিংহ হয়ে উঠি
তীব্র দাঁতের ভেতরে পাতলান জিহ্বা পুরুষ লেহনের তুলনা হয় না
কেশরও একটি বিস্ময়
পুরুষের দাঁড়ি আর গোঁফ বিষয়টিও সিংহ বিষয়ক”

সূচিপত্র

ছড়া

ছড়ায় ছড়ায় ভরাই খাতা

শঙ্কর দেবনাথ

বুকের বীণায়   যখন ঘৃণায়
    বিষের লহর বাজায়,
মনন জুড়ে   আত্মহনন
    শ্মশান-চিতা সাজায়-
তক্ষুনি ঠিক   একটা চড়াই
    প্রাণের মড়াই থেকেই-
আমার ঘরে   বাঁচার ভাষা
    যায় এসে সে এঁকেই।

মন খারাপের   বর্ণমালা

পর্ণশালায় আমার-
দুঃখে ক্ষোভে ছিঁড়তে থাকে
যখন বোতাম জামার-
একটা শিশু তখন এসে
বাগিয়ে ডিস্যু খানাই-
ছন্দে-গন্ধে নতুন ছড়া
লেখার কথা জানায়।

ছড়ায় ছড়ায় ভরাই খাতা
জড়াই ভালোবাসায়-
নদীর মদির দধির স্রোতে
'যদি'র তরী ভাসাই।

সূচিপত্র

সমিত ভৌমিকের কবিতা

কলাগাছ

নরম বাতাসে নেচে ওঠে কলাগাছ

একসময় চিড় ধরে পাতাগুলোর শরীরে

আবার নাচ শুরু হবার আগেই
গলাকাটা কলাগাছ
পড়ে থাকে একা
অসহায় চেতনা জুড়ে...

পিঁপড়ে

এখানে নামে না ক্লান্তি
রাতগুলো শেয়ালের মতো পালায়।

রিপুর দোকানে ভিড় নেই কোনো
বিক্রেতা না খেয়ে মরে

আলো আর আঁধার চেনে না এরা
মাথার কেবল কাজ জমে থাকে।

তোমার উঠোন

এই তো উড়িয়ে দিলাম
অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি,
তোমার উঠোনে

গুছিয়ে নিও
নিজের মত
মিঠে আদরে

মাঠের ফসল আনব তুলে,
খেয়ালি পারদ
লতা পাতার ভিড় সরে, আসুক শরৎ।

সূচিপত্র

সুবিনয় দাশের কবিতা

মুক্তি

বিষণ্ন মুখ, খিলখিল হাসি
হা করা পোয়েট্রি সকল
কপি হাউস, বইপাড়া ঘুরছি
স্বতন্ত্র ট্রিপার হাউস, আঁশটে গন্ধ
আর কিছু মোবাইলে তোলা আপডেট
মুক্তির হাতে তুলে দিলাম

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া বৃষ্টি
আমাদের দুজনকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল

সূচিপত্র

শীত

ঠিকানা চাই কাছের কিংবা দূরের
জানালা খোলা, হাতে ঝালমুড়ি
পানশালায় খুচরোর অভাব

ঘুম ঘুম চোখে ঢুকে পড়ি ক্যাম্পফায়ারে
চারপাশে শুধু কোলাহল
হাসি ইয়ার্কি আর ঠাট্টা, চরুটের
কটুগন্ধ, মৌলিক ট্রলার চেপে
চলে যাচ্ছে ভোরের শীত
জোকারের শব্দ

ফাঁকা মাঠ, গড়াতে থাকি
অবশিষ্ট পাউরুটি আটকে আছে সসে

দস্তখত

ঝলমল বৃষ্টি, সামনে লিফটের
দরজা খোলা, নিচে বসতি
ডানাঝাপটানো আর্তনাদ
বেরিয়ে পড়েছি দস্তখত সংগ্রহ করতে

যথেষ্ট গরম বলে, গা থেকে
কোট খুলে ফেলি, রাস্তায়
দাঁড়িয়ে থাকি বাস ধরার অপেক্ষায়

হাওয়ার অফিস বলছে এবারও
তেমন ভালো বৃষ্টি হবেনা।

সূচিপত্র

নকুল রায়ের কবিতা

বায়বীয় সংস্কারের অনুভূতি

উৎসাহ দ্বিগুণ আমাদের ব্যভিচারে, নগদবাক্যে বৈধতা নিয়ে রাহাজানি
মৃতবৎসরের স্মৃতিউৎসব, গন্ধহীন সুষমাহীন তাজা-নরকের প্রতিভাময়
রাতারাতি বিখ্যাত করে; চোরেরাই আজ মিহিরকান্তির দোকান খোলে
পঁচাত্তুরে বুড়োর পেনসানে চলে প্রপঞ্চক বন্ধুদের চা-বিস্কিট আর স্বরাজনৈতিক
কালচার, প্রতি রোববার গাধাদের ময়দান ভারি – বুদ্ধিজীবীদের
গৃহস্থ-আলাপ, ভালো টাকার মাইনেখোরও চায় বগলের
নিচের শেষ পয়সা – শৃগাল-সভ্যতায় জাতভিখিরি শুধু কবিদের পোষায়

অবৈধফাঁসি আজ গ্রহণ করে বাধ্যতামূলক বৃক্ষ, ঝলসানো ছুরির চারিধার
ঘুরে আসে বিধিসম্মত সাহস, একলক্ষ কুকুরের রক্তচক্ষু নিয়ে ধর্ষণ ও
প্রলয়-যৌনতা মানুষের ব্যথাখানি দ্বিধা করে, কে আছো বীর্যবান

আমাদের কে তুমি রক্ষাকারী, স্বর্ণসিংহাসনচ্যূত কে তুমি তিলকসর্বস্ব
আমাদের নগ্ন-চামড়ায় ঘা তুমি শুকিয়ে যাও, আমাদের প্রচলিত
দারিদ্র্য তুমিও এখনো সর্বস্বান্তে পৌঁছোও নি, তোমাকে গিলোটিনে নিয়ে যাচ্ছে
থানাদানাপোষাকমেরামতি লোক, ছেড়ে যেওনা তুমি রক্তমুখি পবিত্র দারিদ্র্য

ব্যবহারজীবিকা এসে ঘরে তুলে দিয়েছে তালা, মিছিলে যাবো
ব'লে তার আগেই সাততাড়াতাড়ি চেয়েছি সঙ্গম, গুলি এবং
খুনের বিনিময়ে রেখে যেতে চাই উত্তরপুরুষ, চোখের জলের
ব্যস্ততাকে ফিরিয়ে দিয়েছি চোখের কোলে, আমরণ
ইট-যুদ্ধে মাথা ফাটাফাটি কাণ্ডের পর আমাদের মনে
পড়ে – ভারতীয়রা শিবভক্ত – গাঁজা ও আর্যশক্তি স্ফুরণে
আমাদের সংস্কার না-খেয়ে আজ কোষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকতেই
চায়, জ্বলে নির্দ্বিধায় ভৌতিক হৃদয়

সূচিপত্র

কবিতা

এখনো তোমায় ঘিরে

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

একসঙ্গে হাঁটাচলা, ওঠাবসা, রোদে ও শ্রাবণে
জ্যোৎস্নায় বসবাস, ঠিকমতো কবে থেকে
এখন আর মনে নেই।

আছে সারাক্ষণ, আমি ছাড়া আর একজন
অবিকল আমারই মতো, ক্রমাগত রোদে মেঘে
অবিরাম বৃষ্টির ভেতরে;

বাবার হাত ধরে শীতে ভোরবেলা
হলুদ সর্ষে ক্ষেতে, অশ্বিনী তোমার গায়ে

তামাকের পোড়াগন্ধ, মায়াবি শিশিরে ভেজা
পা তোমার, হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন বেশ দূরে
গঙ্গাসাগরে, আশ্চর্য মিনারকোট,
লাক্‌সামে অপরাহ্নবেলা;

দিগন্ত পেরিয়ে পথ, ভাঙা স্বপ্নে পুকুরের পাড়ে
অনন্ত ঘুমের দেশে পিতামহী, ওঠো দুদু,
এ দুপুরে জেগে ওঠো, মাটির থালায় দেখো
কচু শাক, সোনা মুগ, কত ভোজ্য সাজানো হয়েছে,

হাহাকার মিলেমিশে আমাদের অহঙ্কার বেড়ে ওঠে,
উৎসব শেষ হয়ে গেলে রিহার্সালের পোশাক
বদলে যায় নিজের নিয়মে।

ফাল্গুনের ছুটির দুপুরে স্বপ্নের ডানা মেলা গহন নীরবতা,
খাঁ খাঁ শূন্য স্কুলঘরে কী রহস্য কারুকাজে ভরা,
তখনও তুমিই পাশে, দলকলসের ফুলে মাঠময়
শাদা নির্জনতা, দুইজনে হাত ধরে আবছা
নদীর কাছে দাঁড়াতাম।
ফিরিওয়ালাদের ডাক আজকাল হাওয়ায় ভাসেনা,
গেরুয়া বসনে কোনো ভাঙাচোরা মন্থর বাউল
আগের গ্রামের পাশে চলে যায়।

এখন শহর মত্ত, যাপনের উন্মাদনাময়
এখন উড়াল পুলে দিনরাত কাজ হয়
গাঢ় শব্দে কোলাহলে সারারাত ঘুমোতে পারি না,
আগে আগে শূন্যে হাঁটো অশরীরী
দোর ধরে তুমিই দাঁড়াও
মেঘে রোদে অবিরাম বৃষ্টির ভেতরে।

সূচিপত্র

কবিতা

দাবদাহের মাঝে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি

চয়ন ভৌমিক

হাঁটতে হাঁটতে,
কে থামিয়ে দেয় পথিমধ্যে আমার পা?

গন্তব্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারিনা
ঠিকানার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ বাড়ে।

অমলদা বলেছিলেন পাহাড় ওনার প্রিয়
তাই সেখানেই বরফের নীচে রয়ে গেলেন উনি।
সমুদ্রকে ভালোবেসে অবিনাশও

রোজ বসে থাকে বালির বানানো একটা বাড়ির ভিতর।

আমিও তো আসলে একটা পদ্ম-নাভি খুঁজেছিলাম,
গোখরো সাপ যেখানে ছেড়ে গেছে তার খোলস

একটা রুক্মিণী-কোমরে তেঁতুলবিছে হার -
যার বিষে নীল হয়ে উঠেছে সমস্ত ঊরুসন্ধি

এসব খুঁজে পায়নি অমলদা, অবিনাশ
আমাদের মত অনেকেই না।

যেদিকে তাকাই শুধু জঙ্গল
গাছ দিয়ে নয়, পুষ্পঘ্রাণে নয়, অট্টালিকা দিয়ে বানানো স্মৃতিসৌধ সব।

তবুও ছায়াবিহীন, ঠিকানাবিহীন কেটে যায় জীবন।

সূচিপত্র

কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর কবিতা

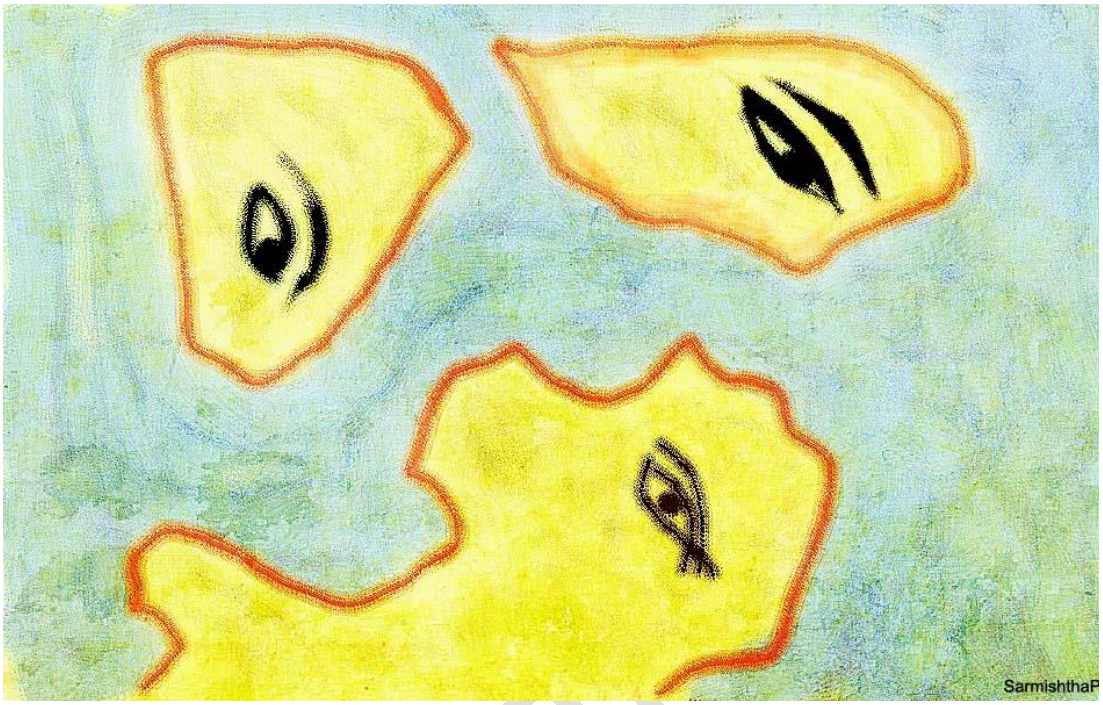

দাবি

পাথর চোখের দৃষ্টি, মাথার ভেতরে তুলকালাম
তোমার স্পর্শের মায়ায় সমস্ত অপরাধ মুখস্থের মত বলে যাই
পুরুষ আর কাপুরুষে যে তিমির ব্যবধান আছে
তা বড়ো হয়ে ওঠে
দৈর্ঘে প্রস্থে আর সমগ্র জ্যামিতির মাপে
কি যে তোলপাড়!
সে কী প্রাণপণ ধ্বনি
সমস্ত পৃষ্ঠা থেকে আকাল জন্মের প্রতিবাদ
মুক্তির দাবি তোলে অক্ষরাশি –

‘থামুক থামুক এই আঁচড় আর নখরের খেলা’।

পারাপার

আর বুঝি বাকি নেই কিছু
বেঁচে থাকার মানে বুঝি কেবলই কৌতুক!
তোমার আমার আর আমাদের আরেকটু ভালোর জন্য
মুখোমুখি ঝুলে আছে কতো ইস্তেহার

দিন যায়, আরো ভারী চশমায় ঢাকে চোখ
কাঁচের ভেতর দিয়ে দৃশ্যমান আমাদের সন্তানের ভিড়
পায়ের নিচে দূর সড়কের ধারালো পাথর
আপাদমস্তক এক অলঙ্ঘ্য পারাপার...

সূচিপত্র

কবিতা

নিরাপদ দূরত্বে

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

নিরাপদ দূরত্বে না থাকলে বোকা চাঁদও এসে
হানা দেবে তেতলার ছাদে, ভিজে গলায়
সব কথাই নির্ভেজাল মনে হয়, শুধু নীল
বিছানায় জোনাকি ঢুকে গেলে
বিসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বাংলা কবিতায়।

আজকাল কে কাকে পুরস্কার দেবে
এ নিয়ে হৈ চৈ করছে কালো কবিরা
নিরাপদ দূরত্বে থাকলেও রাতের আভায়

অবিশ্বাসী করতল ছুঁয়ে যায় লাল
টুকটুকে মৃসণ আপেল, বালিকার

মঙ্গলগ্রহ থেকে এক দঙ্গল বায়ুভুক
কাচপোকারা এসে দখল করে নেবে
রবিবারসীয় সাহিত্যের সবুজ পাতা।

আজকাল কোন দূরত্বই আর তেমন
নিরাপদ নয়, সে কথা জেনেছে
অবোধ-বালিকা।

সূচিপত্র

কবিতা

আকাশপাখি

মাধব বণিক

অসফল বাক্যগুলি মিছিল শেষে বাড়ি
ফিরে গেছে। ব্রহ্মনাদের গার্হস্থ্য-শূন্যতাগুলো
ঝিকিমিকি রোদে পুড়তে পুড়তে
মিশে যাচ্ছে ধুলোয়। না পাওয়ার
পোড়া দাগগুলো নিজে নিজে
বকে চলেছে কু-কথা। আকাশের
অনন্ত পর্যবেক্ষণের পাশে এ যেন
এক গভীর খাদ। গয়ংগচ্ছ পা-দুখানি
অনিচ্ছার সুতো বেঁধে দাঁড়িয়েই থাকে।
বাঁশের গাঁটে লুকোনো পয়সাগুলো

একমনে বাজে, দো-তারার মোহে ফের
চান শেষে বাড়ি ফিরে আকাশপাখি।
ঘর গুছিয়ে শুরু হয় সন্ধ্যেসাজ। পাটনি-বোরাখা
হয়ে যে রাস্তাটি হারিয়ে গেছে বনে, তার খোঁজে খোঁজে
ব্যাকুল আর্তিগুলি পৌঁছে গেছে ড্রয়িংরুম পেরিয়ে
অন্ধ-আততায়ীর পায়ে। নাছোড় গল্পগ্রন্থে আটকে
আছে মৃতমাছির পাখা।

সূচিপত্র

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা

ভাষা

তোমার চোখের ভেতর আমার মুখ লুকিয়ে আছে
তাহলে কে বলে আমাদের ভালোবাসা ভাষা খুঁজে পায়নি?
কাছে এসে দেখো তোমার মুখও কি সযত্নে রাখা আছে
আমার চোখে।

তুমি কি চোখের ভাষা বোঝ? ভালোবাসার সকাল-বিকাল?
সন্ধ্যা-রাত্রি? সহযাত্রী, সহবাস?
চাষবাস না হলে ফসল ভালো হয় না।
যা বৃষ্টি চলছে এখন?
ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু হাসলেই রোদ উঠবে

আর বৃষ্টি থামলেই হেসে উঠবে আউস-অঙ্কুর।

শরৎ

দরজা খুলতেই চাঁদ এসে ছড়িয়ে দিল শিউলি ফুল
ভালোবাসা বাইরে এসে পাতার ফাঁকে তাকিয়ে
দেখছিল রোদের সেই চড়ুই চড়ুই খেলা

ছাতিমফুল খোঁপায় গুঁজে রুপোলি কাশফুল তুমি
বড়মুড়া পাহাড় থেকে একটা হরিণ দৌড়ে এসে
আমার হাত ধরে বলেছিল
শরৎ এসেছে, তুমি যাবে না?

জোনাক জ্বলছে, শুকনো পাতায় সুগন্ধী বনফুল
যাবো,
চলো, বন-জ্যোৎস্নায় ডুবে থাকি সারারাত।

সুচিপত্র

আশুতোষ রানার কবিতা

প্রয়াস

নিহিত মনের কিছু রূপ রূপান্তর

শাব্দিক বিন্যাসে এঁকে যাই নিরন্তর

সাময়িকী

ঘটনার ঘনঘটা চতুর্দিকে ঘোরে
উদ্বেলিত মানুষের মন।

কবিতার ভাব ভাষা বদলায় জোরে
সময় এমন উচাটন।

সুচিপত্র

ঈশানকোণ

দিলীপ দাসের কবিতা

এমন নির্গুণ, তবু

কপটতা শিখিনি বলে কাকেদের সভায়
বড়ো ম্লান হয়ে থাকি। ইহারা কি ময়ূরপুচ্ছ?
ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি।

সার্থক রমণী এক হ্রস্ববসনা
তাকে আমি মিথ্যে বলে জানি,
এমনি কপাল আমার, গুরুজনদের
কথা মেনে, তার কাছ থেকে
আজও কিছু শিখিনি।

এমন নির্গুণ জেনেও, ভাগ্য আমার,

সে শুধু চৌদ্দ পুরুষ নদীর কিনারে
রোদ-বৃষ্টি-ঝড়জলে
মেঘের মাস্তুল থেকে কখনো চোখ সরায়নি –

ইহারা

ইহারা এখন আমাদের জীবিত বংশধর
ইহাদের প্রতিভার আলোকে
দীপ্তিময় চারিধার

যদিও ইহারা শালুকের মূল খোঁজেনি
যদিও ইহারা অভাবের দিনে খায়নি
শামুকের গুগলির গেড়ির মাংস
কিন্তু ইহারা ভালোই জানে চিকেন-রহস্য
সিঁড়ির কয়ধাপ পরে কাহার নিবাস

ইহারাই নাকি এ যুগের শেষ ভরসা
কেননা ইহারা প্রকৃত জানে

সূচিপত্র

কবিতা

কালঘাম ছুটছে

লক্ষ্মণ বণিক

না না করেও অনেক হয়েছে
শোধরানো এত সহজ নয়
কথায় বলে – কয়লার কালো যায় না ধুলে

এরপরও সাংসারিক মেলবন্ধন বলে কথা
স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারস্যাপার কখনো নিঁখুত ব্যাকরণ মেনে
কখনো ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ কারে কয় বলে কার সাধ্যি

তন্নিবন্ধনে আকছার দেখি প্রায় ঘরে ঘরে
ঘটিবাটির মতো তাকে সুন্দর সাজানো, একটাকে ছাড়া অপরাধকে ভাবাই যায়না
কিংবা, দিনভর ঠোকাঠুকি লেগেই রয়েছে।
পান থেকে চুন খসতে না খসতেই চিল-চিৎকার
যেন আজন্মের শত্রু
কোনো পক্ষের কোনো চোখের মাথা রয়েছে কিনা বোঝা শক্ত

হ্যাঁ হ্যাঁ করেও অনেক হয়নি
ভুল করার শিক্ষা নিতে হয়নি কাউকে
আপনা থেকেই হতে থাকে প্রাকৃতিক বিধানের মতো
হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না সত্যি সত্যি কেমন মাণিকজোড়
দেখি আর থেকে-থেকে চোখ কপালে ওঠে কখনো
কখনো খোলার সাহস থাকে না

কখনো দেখে এত মুখ
লক্ষকোটিবার শ্রয়ণের বুকে পা ফেলছি
সেই একই শ্রয়ণে আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি আমার বাপ-ঠাকুর্দার
শত শত পুরুষের শ্রীচরণছাপ; কেবল, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ
সবার্থে মিলিয়ে চলায় হিমশিম খাচ্ছি
কালঘাম ছুটছে সর্বাঙ্গে আমার।

সূচিপত্র

কবিতা

দূর নীতি

কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়

আগুনকে হাজারো কায়দায় হাতের মুঠোয় নিয়ে
চলি। ভাই নয়, বলি 'আগুন আমার দাস'।
যেমন খুশি উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যায় যা খুশি
কারণে, কিংবা অকারণেই।
সাধারণ সুশীল নাগরিক আমরা, নিজের নীতিকে
রেখেছি দিব্যি পকেটে পুরে।
এখন,
বাতাসে ছড়ানো দুর্নীতির জালের হুজুগে
ধরা যাক ক-টা রুই-কাতলা।

সূচিপত্র

কবিতা

পাখি

সদানন্দ সিংহ

তখন খাঁ খাঁ রোদ, বিশ্রী হাওয়ার তাপ
সব খুলে আমি চিৎপাত
আরো চিৎ হতে হতে ঝুলে থাকা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির কোণে
আমি আটকে যাই – এক দাড়িওয়ালা পাখির মুখে
পাখির মুখে কিনা এক গোছা দাড়ি ঢলঢল হয়ে ঝুলছে

জ্ঞানবৃক্ষ কাকে বলে জানিনা, বৃক্ষজ্ঞানী কাকে বলে জানিনা
মৃত্যুর আছে সব কিছু অস্পৃশ্য হয়ে যায়,
মৃত্যু কেমন মহিমাময় ?

মাথার ওপর সমুদ্রোচ্ছ্বাস চলে যাবে বলে
ঝুলে থাকা দাড়ির মুখে আমি সাংখ্যতত্ত্ব খুঁজি;
কপিলের সাংখ্যদর্শন বড্ড অস্বস্তিপূর্ণ

এইসব ভেবে, আরো সব খুলে
আরো চিৎ হতে হতে টের পাই
আমার মাথার চুলে কতো বড়ো বড়ো পাখিদের বাসা
বেঁধে গেছে

সূচিপত্র

সন্‌জিৎ বণিকের কবিতা

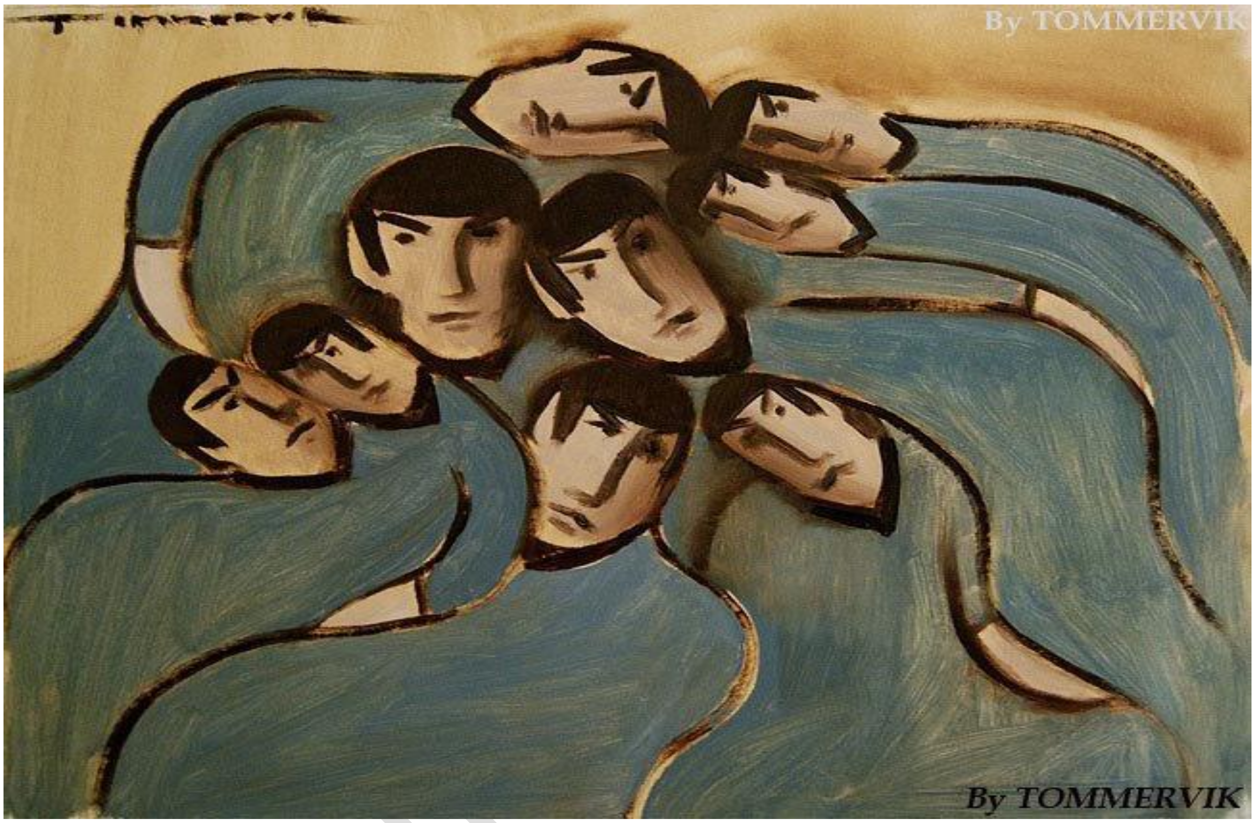

হুল

অঙ্গুলিহেলনে নাচে পুতুল
যে আছে ধরাছোঁয়ায়
বুকের পাঁজর বিক্রি করে
চড়া দাম তো জোগায়!

ভুখা মানুষ সারা দেশ জুড়ে
কোটি সতের,
তাদের মুখ তো চেনে ওরা
গতর বাড়ে যত্রতত্র!

লাজলজ্জা মানসম্মান
নস্যিই বটে আজ
চোখের চামড়া খসে গেলেও
ভয় পায়না মহারাজ।

মাথার 'পরে মহাজন এক
শুদ্ধ-শান্তির সাজ
রাজকার্য যেথায় খুশি
গদির গরম থাক!

অঙুলিহেলনে নাচে পুতুল
নাচে নেতা চোর,
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে
আম জনতাই চোর!

গরীব মানুষ গরীবই থাকে
যতোই বাজাও ঢেলে,
করতালিতে মিটিং-মিছিল
স্বপ্নেরই ডামাডোল!

উল্কা

আকাশ থেকে ছিটকে পড়া তারাদের
পৃথিবীপথে মিলিয়ে যাবার দৃশ্য
দেখেছেন অনেকেই
দুঃসংবাদের সূচনা নাকি বয়ে নিয়ে আসে

এইসব মৃত তারারা!

মানুষের প্রতিদিনকার সুখদুঃখের মতোই
তাদের ঝরে যাওয়া প্রাকৃতিক,
সেখানে দুঃখ নেই সুখ নেই;
যা কিছু প্রাণবন্ত,
রৌদ্র-ছায়ার সুখ আলো-বাতাসের সুখ।
আর বৃষ্টিঝরা রাতের অসুখ
মানুষের আকাশের ও বাতাসের
দিগন্তরেখা জুড়ে
জড়িয়ে যাওয়া সুখ, মনকে ভালবেসে,
আকাশকে ভালবাসে অবিরাম;
বৃষ্টিধারার মতোই।

সূচিপত্র

সন্তোষ রায়ের কবিতা

প্রবাহ

কাত হয়ে শু'লে আর বসন্ত পাই না
মেঘ জমে বুকের কাছে
এখন চিৎ হয়ে শোয়ার সময়
চিৎ হলে দু-দিকে পাড় ভাঙে
ভাবি, উপুড় হয়ে দেখি –
উপুড় হলে শূন্য হয়ে যাই
যত স্বপ্ন বরাদ্দ ছিল জীবনের
        নদী হয়ে যায় –

ধর্ম-অধর্ম

পথের বাঁকে ছিল যত ঢেউ
বুকে করে নিয়ে চলা বন্ধ্যা ভালবাসা
স্বচ্ছ হতে হতে, হে রূপান্ধবতী
তোমার জঠরে এল অলৌকিক শিলা

কে নেবে দায়ভার তার
কে দেবে উন্মত্ত যৌবন তারে
বলো, কে তার পিতা
কোন্ সে দেবতা!

প্রেমকথা

তাকে যখন দেখি অন্য কোনো প্রচ্ছদ তলে
অন্য কোনো ভাষায়
অন্য আঙ্গিকে
তখন কি আর পাতা না উল্টিয়ে পারি পালাতে!
ওল্টাতে ওল্টাতে খালবিল জনপদ
সন্ধ্যার আকাশে ভেসে যায় বলাকা আর উলুধ্বনি

এখানেই শেষ নয়
তমসা মুছে দিতে পারে না স্মৃতি
আগামীর কথাগুলি এসে বসে অতীতের পাশে
জন্ম-জন্মান্তরের মাঝে ছোট্ট হাইফেন—
ডিঙিয়ে যেতে চাই
বিবেক হেসে ওঠে।

অবশেষে ঝরাশস্য কুড়োতে চলি –
রাজার কাহিনি থেকে দূর ফুটিফাটা মাঠে।
এইখানে সবেমাত্র জীবনের শেষ –
এই কথা বলিলেও – শেষ হয় নাই
ভালবাসা এমনই অনন্ত –

অনন্ত

আমার সামনে কোনো দিকচিহ্ন নেই
একটি শস্যদানার পেছনে এত শিশুমন
মাটির সীমানা শেষে এই ডোবে, এই ভাসে
শস্য ও শিশুজীবন
যত যায় আকাশ লাগে না গায়
প্যানোরমা সরে যায় আরো আরো দূর
আমার সামনে কোনো দিকচিহ্ন নেই
ক্ষুধার দিগন্ত নেই
শূন্য জঠর।

সূচিপত্র

মুখোমুখি

সদানন্দ সিংহ

আমাদের প্রদীপদা মানে প্রদীপ সরকারের সঙ্গে আমার যখনই দেখা হয়েছে তখনই আমার সর্বপ্রথম যেটা চোখে পড়েছে সেটা হল তাঁর অমলিন হাসিমুখ। সঙ্গে এক মিলিটারি সাদা গোঁফ এবং সাদা চুল। একেবারে যেন জমিদারি চেহেরা। প্রথম যেদিন প্রদীপদার সঙ্গে দেখা তখনও ওই চেহেরা। আজও একই চেহেরা। আসলে প্রদীপদা সাহিত্যের লেখলেখির জগতে এসেছেন অনেক পরে। শুনেছি আগেও উনি লিখতেন, তবে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের সঙ্গে পরিচয় ২০০১ সালের দিকে। উনি কবিতার বই বের করবেন বলে ভাষা প্রকাশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সেইসময়। তারপর ধাপে ধাপে তাঁর দুটো কবিতার বই, তিনটে গল্পের বই এবং তিনটে উপন্যাসের বই বের হয়েছে পরবর্তী সময়ে। ‘তবুও মানুষ’ উপন্যাসের জন্যে ২০০৪ সালে ত্রিপুরা সরকারের সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। শিক্ষকতার চাকুরি করতেন, অবসর নিয়েছিলেন ২০০৫ সালে।

মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রদীপদার সার্থকতা বেশি দেখি। বর্তমানে প্রদীপদা আগরতলায় থাকেননা। সেদিনই জানলাম, কলম ধরলেই প্রদীপদার হাত কাঁপে তাই এখন লিখতে পারেননা। তাঁর ৭৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ভাষা প্রকাশনের উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে.১৫-০৫-২০১৭ তারিখ সন্ধেয় এক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেদিন প্রায় আশি জনের মতো কবি-লেখক সমবেত হয়েছিলেন। এমন কি ফেসবুকের সংবাদ দেখে বাংলাদেশ থেকে দুজন কবিও (মনির হোসেন এবং বাছির দুলাল) উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রদীপদার জন্ম বাংলাদেশেই। সেদিন কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং নির্মল দাশের (প্রদীপদার উপন্যাস নিয়ে) আলোচনায়, আশিস মোদক এবং শৈবাল রায়ের স্মৃতিচারণসহ, আবৃত্তি ও গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে শেষ হয়েছিল।

সূচিপত্র

ঈশানকোণ

লেখাজমা

ঈশানকোণ দেয় ভাল লেখা প্রকাশের গ্যারান্টি। আপনার ভাল লেখাটি এখনই পাঠান।

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

* ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না ।
* বহুল প্রচারিত নয় এমন লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখা পাঠানো যাবে । তবে খুব প্রচারিত এমন লিটল ম্যাগাজিন, দেশ, আনন্দবাজার সহ অন্যান্য কমার্শিয়াল পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না। তবে নতুন লেখাই কাম্য ।
* যেকোনো লেখা পাঠাতে পারেন । চিত্রকলা, এমন কি ভ্রমণকাহিনিও।
* লেখা পাঠালে ধরে নেওয়া হবে সমস্ত নিয়ম মেনেই আপনার মৌলিক লেখাটি পাঠাচ্ছেন ।
* লেখা মনোনীত হলে ইমেল-এর মাধ্যমে দুমাসের ভেতর জানিয়ে দেয়া হবে যদি লেখক / লেখিকার ইমেল-এর ঠিকানা দেয়া থাকে ।
* লেখা অভ্র বাংলা কিবোর্ড দিয়ে লিখে ইমেল-এর মাধ্যমে পাঠাবেন ।
* ভাল লেখা এলে নতুন বিভাগ খোলা যেতে পারে।
* লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ।
* লেখা WORD বা OPEN OFFICE ফাইলে পাঠাবেন অভ্র কিবোর্ড-এ বাংলায় লিখে। এছাড়া ইমেলের বডিতে লিখেও পাঠাতে পারেন।
* অমনোনীত লেখাগুলি লেখক-লেখিকাকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে ইমেল এর মাধ্যমে।
* আপাতত বছরে চারটি সংস্করণ FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT ও NOV-DEC নাগাদ বেরুবে। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এখনই । স্কেচ সহ পারলে পাঠান।
* ইমেল-এর মাধ্যমে লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ—singhasada@gmail.com
* লেখা ফেসবুকে ইনবক্সে নিম্নলিখিত লিংকেও পাঠাতে পারেনঃ-- https://www.facebook.com/sadananda.singha.9
* এছাড়া আলোচনার জন্যে পত্র-পত্রিকা পাঠাতে পারেন নিচের ঠিকানায়ঃ--

পদ্মা সিংহ
C/O- নন্দালয়, লাইফড্রপ ওয়টার প্ল্যান্টের পেছনে,
অভয়নগর, আগরতলা। PIN-799005

[লেখক-লেখিকাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ লেখা পাঠিয়েই ঈশানকোণ প্রকাশের আগে সেই পাঠানো লেখাটি ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় নিজে বা অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না দয়া করে]

সূচিপত্র

শুভেশ চৌধুরীর কবিতা

আমার কবিতা

একদিন একটি মিথ্যাও বলবো না
সময়কে প্রণাম করবো
যেন সঠিক মুহূর্তটি থেকে তিনি আমাকে জানিয়ে দেন ইহা সত্য
ইহা পাকিয়া টুসটুসে
পরিপূর্ণ
অর্ধসত্য বা অপরিপক্ক নয়

আন্দোলন বুকে

শব্দ ছুটে আসছে কোন শীতল গ্রহ থেকে, সরীসৃপের মত দ্রুত যেনো বিভক্ত তরঙ্গের শৃঙ্খল। এক শীতলতা থেকে বেড়িয়ে এসে বসন্ত গ্রীষ্ম ও বরষায় ঋতুস্নান তার আকাঙ্ক্ষা। আমার অনেকের কথা জানা যারা শীতল হতে হতে ঝরে পড়েছে অমোঘ এক ভালবাসাহীন জগতে, রিক্ত হৃদয় আর কোনদিন দেহে রক্তকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। আজ সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হেতু, কোন পরাজয়কে মেনে নিতে ব্যথা জাগে। যত ঢেউ উঠুক সেই হিম গ্রহটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ চাই। কবোষ্ণ হৃদয় হয়ে উঠুক এই বুক।

সুচিপত্র

আলোচনা

বইপত্র, লিটিল ম্যাগ

শাব্দিক (৪০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বইমেলা ২০১৭) পেলাম। প্রধানত এটা কবিতার কাগজ। তবে কবিতা ছাড়াও কবিতা বিষয়ক গদ্য বা মুক্তগদ্য, বইয়ের আলোচনা এসবও থাকে। ভাবতে ভালো লাগে একটা কবিতার কাগজ চার দশক ধরে একনাগাড়ে বের হচ্ছে। আগে ত্রৈমাসিক ছিল, এখন ষান্মাসিক। এবারের সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন মিলনকান্তি দত্ত, অমিতা চৌধুরী, গোপেশ চক্রবর্তী, সুতপা রায়, দেবব্রত দেব পুরকায়স্থ, আল্পনা দেবনাথ, কৃষ্ণেন্দু দাস, লিপিকা দেব, সুশান্ত বান্দা, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, অনিল কুমার নাথ, মৃণাল কান্তি দেবনাথ, প্রসেঞ্জিৎ দাস, লক্ষ্মণ বণিক, খোকন সাহা, বাঁধন চক্রবর্তী, পার্থ দত্ত, শেফালী দাস, লক্ষ্মণ কুমার ঘটক, কৃষ্ণকুসুম পাল, পিঙ্কু চন্দ, সুদীপ্তা ধর, মৌলিক মজুমদার, অপু লোধ, দেবাশ্রিতা চৌধুরী, ধ্রুব চক্রবর্তী, সদানন্দ সিংহ, পায়েল দেব, স্বপন কুমার দাস, নবীনকিশোর রায়, ছোটন দে, নকুল রায়, নিখিল তালুকদার, সন্‌জিৎ বণিক, দীপিকা বিশ্বাস। কবিতা বিষয়ক গদ্য লিখেছেন নকুল রায় এবং বইয়ের আলোচনায় অশোক দেব। সম্পাদকঃ সন্‌জিৎ বণিক। যোগাযোগঃ মধ্যবনমালীপুর, লালবাহাদুর শাস্ত্রী সরণী, বনমালিপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন ৭৯৯০০১, ইমেল baniksanjitkumar@gmail.com

পাখি সব করে রব (৪র্থ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যা, মার্চ ২০১৭ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যা)। এটা একটা অব্যবসায়িক মাসিক কবিতার কাগজ। ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে প্রকাশিত। ত্রিপুরায় এই মুহূর্তে মাসিক কবিতার কাগজ আর আছে বলে জানা নেই। ফেরুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল সংখ্যায় যাঁরা লেখেছেন তাঁরা হলেন প্রদীপ চৌধুরী, জাহিদ সোহাগ, ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ, পীযুষ রাউত, তন্দ্রা মজুমদার, মিলনকান্তি দত্ত, অজয় কুমার রায়, রশমি আফগান, সমর চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, সুব্রত দেব, নীলদীপ চক্রবর্তী, সুমন পাটারী, সুমনা রায়, চিরশ্রী দেবনাথ, হাবিব মণ্ডল, মন্টু দাস, সুব্রত রায়, হরিহর ভট্টাচার্য, সেলিম মুস্তাফা, মুজিব ইরম, মৌলিক মজুমদার, স্বাতী ইন্দু, প্রদীপ মজুমদার, তমা বর্মণ, সঞ্জীব দে, অরিজিৎ দেব, জাহানারা ইয়াস্মীন, কিশোর রঞ্জন দে, অরূপ দত্ত, অজিতা চৌধুরী, পঙ্কজ বণিক, নির্মল দত্ত, রসরাজ নাথ, সুমনা রায়, মন্টু দাস, নিবারণ নাথ, বিনয় সেন, তমাল শেখর দে। সম্পাদকঃ পীযুষকান্তি দাশ বিশ্বাস। যোগাযোগঃ ষোড়শী ভিলা, বাঘা যতীন সরণি, পোস্ট অফিস- ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯২৫০, ইমেলঃ- dasbiswaspijush@gmail.com

অন্তঃকরণ (৫ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। এটাও কবি ও কবিতার কাগজ। "শূন্যতার ভিতর স্থান নেয় স্মৃতি, বাজ। গর্ভে তখন আলোড়ন, আনন্দ নতুন সৃষ্টির"। এভাবেই অন্তঃকরণ এগিয়ে যায়। এ সংখ্যায় কবি ও কবিতা বিষয়ক গদ্য লিখেছেন অমিতাভ দেবচৌধুরী, জ্যোতির্ময় দাস, শমিতা আচার্য এবং নকুল রায়ের ধারাবাহিক অক্ষর জীবন। কানাইলালের নাটক নিয়ে লিখেছেন লক্ষ্মণ কুমার ঘটক। কাব্যগ্রন্থের এবং কবিতার আলোচনায় সত্যজিৎ দত্ত এবং অনন্ত সিংহ। দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন শুভেশ চৌধুরী এবং অজিতা চৌধুরী। এছাড়া যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁরা হলেন শঙ্খপল্লব আদিত্য, পীযুষ রাউত, স্বপন সেনগুপ্ত, রাতুল দেববর্মণ, সন্তোষ রায়, দিলীপকান্তি লস্কর, লক্ষ্মণ বণিক, দিলীপ দাস, সদানন্দ সিংহ, সমর চক্রবর্তী, দেবব্রত দেব পুরকায়স্থ, অভিজিৎ চক্রবর্তী, শোভন মণ্ডল, সংহিতা সিন্‌হা, গৌতম দত্ত, দেবাশিস চক্রবর্তী, অনুরাগ ভৌমিক, বাপী ভট্টাচার্য, ধ্রুব চক্রবর্তী, রাজু ভৌমিক, রাজীব মজুমদার, শুচিস্মিতা মহাপাত্র, অর্জুন দাস, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, চিরশ্রী দেবনাথ, উমা মজুমদার, তোফায়েল তফাজ্জল, বৃন্দা নাগ, সিদ্ধার্থ নাথ, তনুজ সরকার, শুভদীপ দেব, সুবিনয় দাশ, স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য, আকবর আহমেদ, রাহুল সিন্‌হা, কমলিকা মজুমদার ও অনন্ত সিংহ। সম্পাদকঃ শুভেশ চৌধুরী ও অনন্ত সিংহ। যোগাযোগঃ অলর্কা চৌধুরী, গভর্নর ভবনের পূর্বদিকে, অভয়নগর, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৫, ইমেলঃ antokoron@gmail.com

ভাষাসাহিত্য (১৪তম বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। ভাষাসাহিত্য হচ্ছে ভাষা ট্রাস্ট-এর মুখপত্র। শধুমাত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ কয়েকজন কবি একত্রিত হয়ে ভাষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছিল। জানিনা, শুধুমাত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে বেসরকারিভাবে পৃথিবীর আর কোথাও ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে কিনা। যাঁরা ভাষা ট্রাস্ট গঠন করেন তাঁরা হলেন কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, দিলীপ দাস, সদানন্দ সিংহ, লক্ষ্মণ বণিক, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, মাধব বণিক, শুভেশ চৌধুরী, সন্তোষ রায়, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী এবং অলক দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে প্রদীপ সরকার, অশোক রায়বর্ধন এবং কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়কে এখানে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। প্রথমে ভাষাসাহিত্যের প্রকাশকাল ছিল ত্রৈমাসিক। তবে এখন এটার প্রকাশকাল ষাণ্মাসিক। এ সংখ্যায় কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন মুহম্মদ নরুল হুদা, কবিতায় মুক্তি নিয়ে জয়ন্ত মহাপাত্র (অনুবাদ কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়)। আছে ভারতের ১৬ জন বিভিন্ন ভাষার কবিদের কবিতার বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদগুলি করেছেন প্রবুদ্ধসুন্দর কর, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায় এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য। এছাড়া কবিতা লিখেছেন পঙ্কজ বণিক, পায়েল দেব, চিরশ্রী দেবনাথ, নীপবীথি ভৌমিক, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, মৃণালকান্তি দেবনাথ,

অনিরুদ্ধ সাহা, দেবাশিস ভট্টাচার্য, তন্ময় দেবনাথ, শরাফত হোসেন, তুষ্টি ভট্টাচার্য, মুজিব ইরম, অরিত্র দে, মৌ সেন, দেবপ্রতিম দেব, প্রবুদ্ধসুন্দর কর, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, সদানন্দ সিংহ, অশোকানন্দ রায়বর্ধন, শর্মিষ্ঠা পাল, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী, সন্তোষ রায়, দিলীপ দাস, লক্ষ্মণ বণিক, শুভেশ চৌধুরী, মাধব বণিক, অলক দাশগুপ্ত, শক্তি দত্তরায়, নকুল রায়, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী এবং কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। প্রধান সম্পাদকঃ কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। যোগাযোগঃ শান্তি কুটির, নতুন পল্লি, কৃষ্ণনগর, আগরতলা-৭৯৯০০১, ইমেলঃ bhasatripura@rediffmail.com

সূচিপত্র

ঈশানকোণ

নীতা বিশ্বাসের কবিতা

তুড়ি

শীতের গল্পে
ধোঁয়া ওঠা কথারা বেড়া টপকে তুড়ি মারে
বেআব্রু কাহিনির বৃন্দগানে।
ব্যালকনিতে ধামসা বাজায় কাঁচা খিস্তির উল্লাস।

মাটি থেকে জ'ন্মে বৈদেহী
এইসব গল্পগাছা অপমান ঢাকে মাটিতেই
মাঝখানে থাকে গয়ংগচ্ছ সময়ের সেতু
কিছু কাঠবেড়ালির ক্যারিশ্মা
অনেকখানি বাঁদরামির তুড়ি
আর

একটি ভিতুরামের থ্যালাসেমিক বীর্য...

কেউ কি জানে

লাইফ রিস্কের রাজনীতিতে
সুখের অরিগ্যামী বাজিয়ে, মজলিশ
অর্থময় হয়ে ওঠে দিনদুপুরের পুকুরচুরির
কড়াকিয়ায়।

এ্যান্ড্রোমিডায় কুয়াশা নামে
যে রহস্য দোল খায় তার
মাথায় ছাতা ধরার দুর্বার সাহসে
অন্ধকারে ফুটে ওঠে ফিসফাস সময়রা

নদীর মা-পনায় কোলে কাঁখের সভ্যতা
সুরেলা বাজিয়েছিলো কোনোদিন...

নদী-সমুদ্রের নিজস্ব নীতিবোধে
বাজারের ছায়া নেই।

মণিকর্ণিকার অগ্নিরিলেরেসের ব্যাটনে
বহ্নিমান খোলা চিঠি হাত নাড়ছে
কে জানে পরের আগুনে যার
চিতা জ্বলবে সে
আদপে পুড়তে চেয়েছিলো কিনা...

চলি

আকাশের অক্ষরে পূর্ণিমালোর
গুঁড়ো গুঁড়ো গানে দুলালো আমার স্তব্ধ
চোখ ছাপিয়ে চাওয়া
লাগলো ডালপালায়
হিন্দোল...

শস্যস্নানে আছি
খোলা গায়ে ঝরে পড়ছে স্বাদুয়ানা
তোমার করমচা কপোলে এঁকে দিই
ঠোঁটচিহ্নের পলাশ
গোলা উপছানো সুখ

আর চলি লাইটহাউস বিহীন,
সর্ষেদানার প্রগাঢ় যে পথের পায়ে লেগে আছে ...

কুহক

নেশাচোখ
বৈশাখী রোদ্দুর, তুমুল
পশম-খোলা চাউনির বেপরোয়া
জ্বলে যাওয়ার পিনকোড বসালে
কত যে ঠিকানায়!
পাসওয়ার্ডে বাজালে ছিলেকাটা শিহরণের লিরিক!

তূণে তোমার এত বেহিসেবি বাণ!
রুদ্র হে, এত
বেহিসেবি বান!